শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

শুভ
শারদীয়া সংখ্যা
২০২৪

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

"জাগরণে যারে দেখিতে না পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি দেখা দেয়,
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
সদা মনে হয় সে যে কাছে নাই;
যেন এ আমার আকুল আবেগ,
তাহারে আনিবে ডাকি,
দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি।"

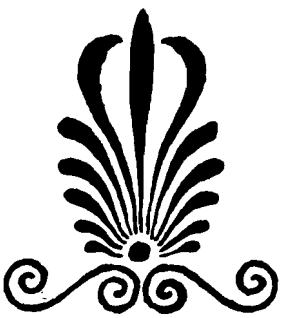

পিতৃদেব ৺রমেন ভট্টাচার্য্য ও মাতৃদেবী ঁসুমিত্রা ভট্টাচার্য্যকে স্মরণে রেখে

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
নীলাঞ্জন, সোহিনী, অঙ্কিত ও আরভ্
মুম্বাই

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

৬৩তম বর্ষ ● শুভ শারদীয়া ১৪৩১ সন ● তৃতীয় সংখ্যা

সেক্রেটারী: শ্রী সুরজিৎ দে

সম্পাদিকা: শ্রীমতী কনিকা পাল

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এ.ই. ৪৬৭ সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

ফোন: ২৩২১-৫০৭৭/৫১২৩, মোবাইল: ৮০১৭২২৭০৯৯

E-mail: sreesreemohananandatrust@gmail.com / mohananandasamaj@gmail.com

মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। ফোন: ৯৮৩০১৮৮৭২৪

সূচীপত্র

সতাং প্রসঙ্গ—শ্রীমুখে	শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ	৬১
গীতার মর্ম	শ্রীদেবপ্রসাদ রায়	৬৪
'দেবী শ্যামাসুন্দরী'	শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়	৬৮
পুণ্য-পরশ-পুলক (১৬শ পর্ব)	শ্রীবসুমিত্র মজুমদার	৭০
স্মৃতির আলোকে বিগত দিন	শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র	৭২
কাশীতে কয়েকটা দিন (দ্বিতীয় পর্ব)	শ্রীসোমনাথ সরকার	৭৫
"শাক্ত ও বৈষ্ণবের সম্মিলিত রূপ দেবী কালী-কৃষ্ণ"	রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়	৭৮
বৃক্ষদেবতা (১)	শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক	৮০
প্রার্থনা (পূর্বে-প্রকাশিত)	শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়	৮২
আনন্দদায়ক সুখদায়ক	স্বামী শিবানন্দ গিরি	৮৩
দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমূহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী		৮৫
গুরুর সন্ধানে		৮৭
মায়ার ফাঁদ	শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল	৮৮
'মা যে আজি এলেন দ্বারে...' (সম্পাদকীয়)		৯০

শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর স্মরণে শ্রী অরূপ সেন ও শ্রীমতী কাবেরী সেনের— সৌজন্যে।

সত্যং প্রসঙ্গ
শ্রীমুখে

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

প্রশ্নঃ মহারাজ, এই সংসারে স্বামীপুত্রের সেবা করে অনেকসময় তাঁদের অনুকূলতা পাই না অনেকসময় নানাভাবে চিত্তের বিক্ষেপ ঘটে সেজন্যও ভগবদ পথে যাবার অন্তরায় ঘটে।

মহারাজজী ঃ বিক্ষেপ যদি ঘটেও থাকে সেই বিক্ষেপের মাঝেও তাঁকে স্মরণ করবে। বস্তুতঃ বিক্ষেপ, বাধা, বিরহ মায়ার আবরণ। এ সকলেরও ভগবৎ অনুভূতি লাভের পথে প্রয়োজন আছে। সূর্য্য মাঝে মাঝে ঢাকা পড়েন। অন্ধকার আসে নিশায়। তাই সূর্য্যের আলোর মহিমা আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। তাই কার্লাইল বলেছেন "The healthy does not know the value of health but the sick knows", রবীন্দ্রনাথও বলে গেছেন, "ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায় তবু জেনো মন তোমারে চায়।" বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই এরূপভাবে তাঁর শরণাপন্ন হবে মনে মনে তাঁকে জানাবে "যা কিছু আমার সকলি কবে, নিজ হাতে তুমি কাড়িয়া লবে, সকল হারায়ে পাব গো তোমায় মনে মনে মন তোমারে চায়" আর তাঁর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও ব্যাকুলতা থাকলে তিনি সবকিছু অনুকূল করে দেবেন। অনুকূলতা সকলকে সম্পাদন করে নিতে হবে। সংসারকে অনুকূল করে নিয়েই তাঁকে ডাকবে। যাঁরা ভক্ত তাঁরা অতন্দ্র হন। সংসারের প্রতি কর্তব্য, প্রতি কাজে তাঁরা অতন্দ্র, অপ্রমত্ত অনলস। ভগবান তো সংসারকে বাদ দিতে বলেননি।

আবার সংসার করাই যে জীবনের উদ্দেশ্য তাও বলেননি। সংসার করো কিন্তু সর্বদা তাঁকে স্মরণ করে করো। যুদ্ধের মতো এত বড় চিত্তবিক্ষেপকর তো আর কিছু নেই। কিন্তু সেই পরম বিক্ষেপের সময় কুরুক্ষেত্র রণপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে শ্রীভগবান বললেন, "তস্মাৎ সর্বেষু ইত্যাদি", "আমাকে স্মরণ করো ও যুদ্ধ করো।" এইরূপভাবে সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত হয়ে সংসার করে গেলে এমন একটি অবস্থা হবে যখন বাইরে অনলস ভ্রম-প্রমাদহীনরূপে প্রতিটি কাজ সংসারের নিখুঁতরূপে করে যাবে কিন্তু মনে মনে কেবল তাঁরই সঙ্গে সম্বন্ধ। সংসারে থেকেও তখন তুমি সংসারে নও। তখন তাঁর কথাই কথা, তাঁর উপর নির্ভরই নির্ভর। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধই সম্বন্ধ। তাই এই বর্তমান কলিযুগে সংসারে থেকেও তাঁর প্রতি এইরূপ অনুরাগ আনতে হলে নামের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। নামই এ-যুগে সকলের অপেক্ষা উপযোগী এবং সহজসাধ্য সাধন।

প্রশ্নঃ ভগবান তাঁর নীরব মহামৌনের অন্তরালে যে ইচ্ছা নিহিত রাখেন তাঁর সেই অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত আমরা জীবনে ধরে নিতে পারব কেমন করে? তাঁর অভিপ্রায়কে বিকশিত করে তোলা, অভিব্যক্ত করে তোলার চেয়ে বড় লক্ষ্য তো আর কিছু আমাদের জীবনে নেই।

মহারাজজীঃ শুদ্ধচিত্তে তাঁর ইচ্ছার ইঙ্গিত ধরা পড়ে। ভগবান তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ ত্রিধাবিভক্তরূপে করেছেনঃ, বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর। বিরাটরূপে এই বিশ্বে তিনি স্থূল বহির্দৃশ্যে প্রকাশিত। হিরণ্যগর্ভরূপে তিনি জীবের অন্তর্যামী, তারও পরে ঈশ্বর। তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ এই জীবনে ধরতে হলে তাঁহাতে একান্তরূপে তন্ময় হতে হবে। তাঁর বিরাটরূপের উপাসনার পর তাঁর হিরণ্যগর্ভরূপ মনোময়ী প্রকাশের সঙ্গে যোগ রাখতে পারলে স্থূলে তাঁর নয়নের অন্তরালে থেকেও মানসে তাঁর সংকল্প তাঁর ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা হয়ে যাবে। তাঁর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সকল শাস্ত্রে বলেছেন। সৎ, চিৎ, আনন্দ। তাঁর উদ্দেশ্যে তাঁর প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করলে কর্ম্মযোগ তাঁর এই সৎরূপের উপাসনা। জ্ঞানযোগে প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁর চিৎরূপের উপাসনা। আর শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা তাঁর আনন্দময়রূপের উপাসনা। এই, অপাতদৃশ্যমান, অপাতবিরোধী জগৎদৃশ্যের অন্তরালে তাঁর ইচ্ছার যে বাণী নিহিত আছে, তাহা যতক্ষণ আমরা স্বার্থপ্রণোদিত সকামরূপে কর্ম করে যাই কিছুই বুঝতে পারিনা। কিন্তু প্রতিটি কর্ম্ম যখন যজ্ঞ অর্থে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, তখন কর্মে আর বন্ধন থাকে না।

তাই গীতায় বলছেন, "যজ্ঞার্থাৎ...ইত্যাদি" কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই তন্ময়তা লাভ করবার উপায় কি? কেউ ধ্যানদ্বারা আত্মস্বরূপের প্রকাশ ধরতে পারছেন, কেহ বা সাংখ্য যোগ, বুদ্ধি বিচার, ধারণা শক্তি দ্বারা, কেউ কেউ কর্ম্মযোগের দ্বারা। তবে এইটি সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে তাঁর সঙ্গে আমাদের চিরসম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে যোগে আমাদের নিত্য অধিকার। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন যে আমাদের সত্তা, আমাদের অস্তিত্ব শুধুমাত্র তাঁরই লীলাবিলাসের জন্য "আমার মাঝে তোমার লীলা হবে, তাই তো আমি এসেছি এই ভবে" ইত্যাদি এই যে তাঁর সঙ্গে আমাদের নিত্য যোগ বর্তমান উপাসনার দ্বারা সেই যোগকে সর্ব্বদা, সর্ব্বমালিন্য হতে মুক্ত করে তাঁকে আত্মপ্রকাশের অবকাশ করে দিতে হবে। অনুক্ষণ তাঁর সমীপে বাস করতে হবে। সকল শাস্ত্রে তাঁর স্বরূপের বর্ণনা করেছেন তিনি সচ্চিদানন্দ। তাই ঋষিরা প্রভাতে প্রথম উপাসনা করে, অসতো মা সদ্গময় ইত্যাদি। অসৎ হতে আমাকে সৎ-এ নিয়ে যাও , এটি তাঁর সৎরূপের আবাহন অন্ধকার হতে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও, এটি তাঁর চিৎরূপের উদ্বোধন আর মৃত্যু হতে আমাকে অমৃতে উত্তীর্ণ করো, এটি তাঁর আনন্দময় রূপের উপাসনা। তাঁর ইচ্ছাকে বুঝতে হলে তাঁর স্মরণ, অবিশ্রান্ত অবিচ্ছেদ্য অনুক্ষণ স্মরণই উপায়। তাই গীতায় বলেছেন "ময্যেব মন... ইত্যাদি"।

আমাতেই মন বুদ্ধি সকলই সমর্পণ করো, অধ্যয় করো, এইটিই সর্ব্বোত্তম। কিন্তু যদি এইরূপ ভাবে অবিচলিতরূপে আমাতে চিত্তের অভিনিবেশ করতে সক্ষম না হও তবে হে অর্জ্জুন অভ্যাস যোগের দ্বারা দৃঢ় সংকল্প করে আমাকে পাবার চেষ্টা করো । যদি তাহাতেও অসমর্থ হও, তবে আমার কর্ম্ম মনে করে সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করো।" তাঁকে আহ্বান করে বলো, "আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালো। সব দুঃখ শোক সার্থক হোক লভিয়া তোমারই আলো।" আমি যত দীপ জ্বালিয়েছি তাহে শুধু জ্বালা শুধু কালী, পরশমণির প্রদীপ তোমার অপলক তার আলো, সোনা করে লবে পথকে আমার সব কলঙ্ক কালো" যখন এইরূপভাবে তাঁর প্রতি শরণাগতি আসবে, তখন এই বিরাট বিশ্ব যোগ্যশালার অন্তরালে যে বিশ্বনিয়ন্তার সংকল্প বা ইচ্ছা লীন হয়ে রয়েছে, তা ধরতে বুঝতে পারবে। তখনই আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করবো ভগবান মঙ্গলময়। কারণ ভক্ত তখন কোন একটি সুখ বা দুঃখের লাভ বা ক্ষতির ঘটনাকে আর বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারবে না। প্রতি ঘটনা, প্রতি কার্য তখন তার সমগ্র ইচ্ছার ইঙ্গিতের সঙ্গে মিশিয়ে সে দেখবে। আমাদের এই খণ্ড, সীমাবদ্ধ বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি দিয়ে যা মনে হয় অন্যায়,

অবিচার, ক্ষতি, ভক্ত তাঁর বিরাট ইচ্ছায় তাঁর অসীম জ্ঞানে তাঁর সমগ্র সংকল্পে নিজেকে একীভূত করে দিয়ে মহাকাব্যের আসল নিহিতার্থ বুঝতে পারেন তখনই এর অর্থ বুঝবে-"তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি যাই; কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই। মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ দুঃখ হয় যে দুঃখের কূপ, তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।" নিখিল বিশ্বের যত জীব সৃষ্ট হয়েছে একমাত্র মানুষের মধ্যেই ভগবান তাঁর এই অলিখিত মৌন বাণীর ইঙ্গিত বুঝতে পারবার ক্ষমতা দিয়ে তাকে পাঠিয়েছেন। তাই মনুষ্যজন্ম সকল জন্ম অপেক্ষা দুর্লভ। এই মনুষ্যজন্মেই এই মনুষ্যদেহেই তাঁকে পেতে হবে। যদি পাবার এতটুকু বাকী থাকে আবার ঘুরে আসতে হবে। তাঁর মধ্যেই বিশ্বচরাচরের বিধৃতি। যদি যা কিছু সকলি তাঁর মধ্যে অধ্যাস করে দেখতে পার, তবে বাইরের কর্মজাল বহিসংসারের ঘটনা জাল কিছুই তোমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না। সমস্ত অতিক্রম করেও তার ইচ্ছা লিপি পাঠ করতে পারবে। তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি বললেন, "তুমি যুদ্ধ করে যাও, পাপ হবে না আমারই ইচ্ছা পূর্ণ করা হবে মাত্র।" "তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে সত্য করে পায় যে আপনারে নিজেরে সে তোমারই মাঝে দেখে, জীবন তার বাধায় নাহি ঠেকে, দৃষ্টি তার আঁধার পরপারে।" এইরূপ হতে পারলে তখন অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে আসবে মৌন মুখর হবে, তখনই তাঁর ইচ্ছার অর্থ হৃদয়ে ভাস্বর হয়ে উঠবে।

প্রশ্নঃ বাবা, মন কী করে স্থির হয়, একটু বলে দিন।

মহারাজজীঃ মন স্থিরতার জন্যই তো সকল সাধনা। শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে ভগবান বলেছেন একমাত্র কর্ম্মের দ্বারাই আমাদের এই সদাচঞ্চল মনকে স্থির করতে হবে। অর্জ্জুন এত ব্রহ্মচর্য্য ও সাধনারত ছিলেন, কিন্তু তাঁকেও সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করে তবে ভগবান ছাড়লেন। ভগবান আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কর্ম্ম করবার জন্য। তা না হলে আমরা পাথরের মতো নিশ্চল ও জড় হয়ে যেতাম। সংসারের নানান ঘাত-প্রতিঘাত ও বিক্ষেপের মধ্যে কেবল সর্ব্বসময় একমাত্র তাঁকে আশ্রয় ও স্মরণ করে আমাদের সকল কর্ম্ম করে যেতে হবে। কর্ম্ম, পরহিতের জন্য কর্ম্ম না করলে চিত্তশুদ্ধি হবে কী করে? মন নির্ম্মল না হলে কি স্থির ও শান্ত হয়? কর্ম্ম করবার সময় ঠিক ঠিক আপনার পরীক্ষা হয়। মনে কত কি গলদ আছে। বিষয়-বাসনার দিকে কতটা টান বা আসক্তি আছে, স্বার্থপরতা কতটা আছে। সহ্যগুণ কি রকম আছে এগুলো ক্রমশঃ বাড়ছে না কমছে, এসকল জানবার উপায় একমাত্র কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ভেতর দিয়েই তার প্রতিকার সহজ। সদসদ্বিচার, অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মপরীক্ষার ভাব থাকলে মন ক্রমশঃ নির্ম্মল ও নিষ্কাম হয়। অহংভাবের নাশ হয় হৃদয়ে প্রেম আসে। তখন আর কর্ম্মে কর্ম্মবোধ থাকে না, কর্ম্ম বন্ধনের হেতু না হয়ে মুক্তির হেতু হয়। আমরা যদি কেবল ঠাকুর-ঘরে বসে ধ্যান ধারণা করি এবং অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কিছুক্ষণ চিত্ত স্থির ও অন্তরমুখী হয়, কিন্তু সেই স্থিরতা কখনও চিরস্থায়ী হতে পারে না, কারণ আমরা দেখি যে ফের সংসারের কোলাহলে নেমে এলে আমরা সব হারিয়ে ফেলি এবং মন অশান্ত হয়ে পড়ে। সর্ব্বদা তাঁকে অন্তরে স্মরণ করতে পারলে ধ্যান-ধারণার কোন দরকার হয় না। তাঁকে ভুলে থাকাটাই তো সব চাইতে বড় বিচ্ছেদ।

গীতার মর্ম

শ্রীদেবপ্রসাদ রায়

আধুনিককালেও শ্রীঅরবিন্দের জীবনে এই পরিচয় পাই আমরা। বন্দীদশায় আলিপুরের নির্জন কারাকক্ষে তিনি যেন উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠলেন। তাঁর মতো চিন্তাশীল, ধ্যানপরায়ণ মানুষও সেই একলা কুঠরির মধ্যে Solitary cell এ যখন আবদ্ধ হলেন, তখন তিনিও যেন পাগলের মত হয়ে উঠলেন। দিনরাত তাঁর ভাবনা যে আমার জীবনে যা কিছু লক্ষ্য ছিল, তার, কিছুই পূর্ণ হবেনা, এইভাবে জেলের মধ্যেই হয়তো চিরকাল আমাকে পচে মরতে হবে। শেষ পর্যন্ত এই হল আমার জীবনের পরিণাম। এইসব নানান ভাবনা চিন্তায় তাঁর মতো মনীষী যখন উদগ্র ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, সেই সঙ্কট মুহূর্তে নির্জন কারা কক্ষ আলোকিত করে দেখা দিলেন স্বয়ং বাসুদেব এবং এই শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতাই তিনি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। আর তার ফলে গীতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। এই সঙ্কট আজ এসেছে অর্জুনের জীবনে কিন্তু এলেই শুধু হয় না, সঙ্কট এলেই যদি আমরা মুষড়ে পড়ি, তমোগ্রস্ত হয়েই থাকি, তার থেকে জাগতে না পারি তাহলে পরের ধাপগুলি আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। সেটা দেখানো হয়েছে এর পরেই।

অর্জুন উবাচ
কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন।।২/৪

ইষুভিঃ—বাণসমূহের দ্বারা। পুজার্হৌ—পূজার যোগ্য।

—হে মধুসূদন! হে শত্রুমর্দন! যে ভীষ্ম ও দ্রোণ পূজার যোগ্য তাঁদের সঙ্গে কী করে আমি বাণের দ্বারা যুদ্ধ করব।।

ব্যাখ্যাঃ— ভগবানের তিরস্কারে অর্জুন যেন একটু প্রকৃতিস্থ হলেন। তিনি বললেন আমি স্নেহ বা কাতরতার জন্য রণে পরাঙ্মুখ হইনি, কিন্তু যুদ্ধের অন্যায্যত্ব ও সেই কারণে অধর্মই আমার নিবৃত্তির কারণ—নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাৎ উপরতোহস্মি। কিন্তু যুদ্ধস্য অন্যায্যাত্বাৎ অধর্মত্বাচ্চেতি। ভীষ্ম কুলবৃদ্ধ পিতামহ, দ্রোণ ধনুর্বিদ্যার আচার্য্য, এঁদের ভক্তিসহ ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করাই আমার কর্তব্য। যাঁদের সঙ্গে বাগ্ যুদ্ধে-তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়াও নীতিধর্মবিরুদ্ধ। তাঁদের কি বলে তীক্ষ্ণশরে বিনাশ করব? শাস্ত্রে আছে-গুরুং হুংকৃত্যত্বংকৃত্য বিপ্রান্নির্জিতা বাদতঃ। শ্মশানে জায়তে বৃক্ষঃ কঙ্কগৃধ্রোপসেবিতঃ- 'যে ব্যক্তি গুরুজনের প্রতি অহংকার বা তর্জন কিংবা 'তুই' ইত্যাকার পদ ব্যবহার করে অথবা সাধু ব্রাহ্মণকে বাদবিবাদে পরাস্ত করে, সে মরণান্তে কঙ্কগৃধ্রের নিবাসস্থল হয়ে শ্মশানে বৃক্ষরূপে জন্মায়। দুষ্টগণই

হননীয় পূজ্যপাদ সাধু আচার্য্যগণতো বর্ধাহ নন। তবে হে ভগবন্! তুমি দুষ্টদলনকর্তা হয়ে আমাকে পূজ্যদের বধে প্রবৃত্ত করছ কেন?

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্, শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে। হত্বার্থ কামাংস্তু গুরুনিহৈবভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্।।২।৫

—মহানুভব গুরুদেব বধ না করে ইহলোকে আমি ভিক্ষান্ন খেলেও আমার কল্যাণ হবে। এঁদের বধ করলে আত্মীয়দের রক্তমাখা কামনারূপ ভোগ্য বিষয় আমাকে এই জগতেই উপভোগ করতে হবে।

ব্যাখ্যাঃ—ভিক্ষাবৃত্তি চতুর্থ আশ্রমীর ধর্ম—'লোকৈষনায়াশ্চ ব্যুত্থায়থ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি (বৃ, উ ৪।৪।২২)

প্রাচীন বিদ্বানগণ মনে করেন যে আমাদের আত্মাই একমাত্র লভ্য-একমাত্র ফল আমরা প্রজা, সন্তান দিয়ে কি করব, তারা পুত্র, বিত্ত বা স্বর্গ কামনা করেন না, না করে ভিক্ষাচর্যা সন্ন্যাস নেন।

[লোকৈষণা হতে ব্যুত্থিত (বিরক্ত) হয়ে তাঁরা ভিক্ষাচর্য অবলম্বন করেন)]। অর্জুন ভিক্ষাচর্য নিতে চাইছেন অথচ ব্যবহার করছেন আসক্ত গৃহীর মত। ভিক্ষুকের লক্ষণ কি, তা জানেন না।

গৃহস্থ ক্ষত্রিয় মহাবীর অর্জুন তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতা মনে করার ফাঁদে পড়েছিলেন। বর্ম টর্ম গায়ে জড়িয়ে ভয়াবহ সব অস্ত্র-শস্ত্র রথে পুরে আত্মীয় শত্রু নিধনের জন্য যুদ্ধ করতে এসে হঠাৎ তাঁকে ঋষিভাব পেয়ে বসল।

শ্রীভগবানের কাছে তিরস্কৃত হয়ে অর্জুনের সুর বদলে গেছে। প্রথম অধ্যায়ে যেমন জ্ঞানগর্ভ যুক্তি দিচ্ছিলেন, এখন তিরস্কৃত হয়ে যেন থতমত খেলেন। বাক্যের কশাঘাতে অর্জুনের চেতনা খানিকটা ফিরে এসেছে। তাই ভুলটাকে কিছুটা সামলে নিয়ে অর্জুন একটি জিজ্ঞাসামূলক উত্তর দিলেন—'কথং ভীষ্মং... পূজার্হাবরিসূদন (২।৪)। অর্জুন বুঝেছেন যে, মাতুল, শ্বশুর, শালা সম্বন্ধী এদের কি করে বধ করব, এই মেয়েলি কান্না নিতান্তই অচল। তাই এবার আর সবাইকে বাদ দিয়ে দুজনকে আঁকড়িয়ে ধরেছেন। সে দুজনই পূজার্হৌ পূজ্যপাদ-পিতামহ ভীষ্ম আর অর্চনীয় গুরুদেব দ্রোণাচার্য। অর্জুন প্রশ্ন তুলেছেন। এই দুজনের প্রতি কী করে বাণ নিক্ষেপ করব? গুরুহন্তা হওয়ার চেয়ে ভিক্ষা করে বেঁচে থাকা শ্রেয়ঃ নয় কি?

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জীজিবিষাম—
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ।।২।৬

—এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন্‌টি আমাদের পক্ষে অধিক গৌরবসূচক, তা জানিনা, কেননা যাদের সংহার করে আমি জীবিত থাকতেই চাইনা, সেই ধার্তরাষ্ট্রগণই আমাদের সামনে অবস্থিত রয়েছেন।

ব্যাখ্যা— অর্জুন তাঁর যুদ্ধে স্পৃহা না থাকার স্বপক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তার মধ্যে আমরা

দেখতে পাই শ্লো-১ যুদ্ধে স্বজনদের নিহত করে শ্রেয়ঃ দেখছি না— সন্ন্যাসী আত্মোপাসনায় যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন, ধর্ম যুদ্ধ করতে করতে নিহত ব্যক্তিও সেই লোকপ্রাপ্ত হন। জয় করে রাজ্য ভোগ করা শ্রেয়ঃ কর্ম এবং মোক্ষাভিলাষী হওয়া শ্রেয়ঃ। অর্জুনের সংশয়ের মধ্যে কঠোপনিষদের মন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে— 'অন্যচ্ছ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং জিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতিহীয়তে হর্থাদ্য উপ্রেয়ো বৃণীতে।। যম নচিকেতাকে বলেছেন, শ্রেয়ঃ মার্গ ভিন্ন, তেমনি প্রেয়ঃ মার্গ ও ভিন্ন। নানা অর্থে তারা উভয়ে পুরুষকে বন্ধন করে। তার মধ্যে যাঁরা শ্রেয়ঃ অবলম্বন করে তাঁদের সাধুই হয়। কিন্তু তিনি প্রেয়ঃ বরণ করেন, তিনি শ্রেয়োমার্গ হতে বিচ্যুত হন। এই চিন্তার মধ্য দিয়ে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই শ্লোকেই তিনি আরও বলেছেন, ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ, অর্থাৎ হে কৃষ্ণ আমি রাজ্যের অভিলাষ করিনা— এখানে ঐহিক ফলের প্রতি বিরাগ এবং (শ্লো ১/৩৫-) অপি ত্রৈলোক্য রাজ্যস্য হেতোঃ অর্থাৎ ত্রৈলোক্যরূপ রাজ্যের জন্যও এখানে পারলৌকিক ফলে বিরাগ দেখান হয়েছে। স্বর্গাদি সুখেও বৈরাগ্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই দুটি কথার মধ্য দিয়ে ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ এর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। (৩) শ্লো-১/৪৩) নরকে নিয়তং বাসো—অর্থাৎ নরকে নিয়ত অবস্থিতি হয় এই স্থলে আত্মা যে স্থূলদেহ হতে স্বতন্ত্র (অতিরিক্ত পৃথক), তাই বলা হয়েছে। (৪) (শ্লো১/৩২) 'কিং নো রাজ্যেন' অর্থাৎ আমাদের রাজ্যে প্রয়োজন কি— এই উক্তির দ্বারা মনোনিগ্রহ রূপ 'শম' দেখানো হয়েছে। (৫) একই শ্লোকে কিং ভোগৈঃ, অর্থাৎ ভোগ সকলে প্রয়োজন কি?—-এর মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ 'দম' দেখানো হয়েছে। (৬) (শ্লো-১/৩৭) যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি— এই কথার মধ্য দিয়ে নির্লোভতা অর্থাৎ উপরতি দেখানো হয়েছে। (৭) (শ্লো-১/৪৫) তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ (অর্থাৎ তা আমার পক্ষে অধিক মঙ্গলতর হবে বলায় তিতিক্ষা প্রকাশ পেয়েছে-এইটাই অর্জুনের বক্তব্যের প্রতিপাদ্য অর্থ। চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন— নিত্যানিত্য বিবেক, ইহা মুত্রফল বিরাগ, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা। আর এই অধ্যায়ে ২/৫ শ্লোকে শ্রেয়ো ভোক্তুম্ ভৈক্ষ্যমপি অর্থাৎ ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়— এই বাক্যে ভিক্ষাচরণ দ্বারা সন্ন্যাসের ভাব সম্যকরূপে সূচিত হয়েছে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছায় ব্যাকুল হয়ে এই সমস্ত ভাব নিয়ে শিষ্য সদ্‌গুরুর কাছে যায় ও আত্মনিবেদন করে। তাই অর্জুন পরের শ্লোকে বলেছেন—

কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম-সংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।২/৭

—আমি কার্পণ্যদোষে কলুষিত চিত্ত প্রকৃত ধর্মবুদ্ধিবিমূঢ় হয়েছি। আমি শিষ্যত্বগ্রহণ করে তোমার শরণাগত হয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি আমার শ্রেয়ঃ সাধনের উপদেশ দাও।

ব্যাখ্যা— এতক্ষণ প্রাণস্পর্শী ভাষায় ও পরিপক্ক যুক্তির উপরেই অর্জুন নিজপক্ষকে দাঁড় করিয়েছিলেন। সঙ্কটের মধ্যে পড়ে ও ভগবানের কাছে তিরস্কৃত হয়ে ধৈর্য্য হীন অর্জুন আর স্থির থাকতে পারলেন না।

তখনই বললেন, ন চৈতদ্ বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ঃ- কোনটা যে ভাল, কোন্‌টা যে মন্দ, তা একেবারে বুঝছি না। এতক্ষণ অর্জুন নিজেকে খুব বুদ্ধিমান বলে মনে করেছিলেন, তীব্রভাষায় ভর্ৎসিত হবার ফলে তার বুদ্ধির গোড়া একটু নরম হয়েছে। সবই যে তিনি বোঝেন না, এটা এবার যেন তিনি বুঝতে পারছেন। সেই বোধের সঙ্গে সঙ্গে আসছে জিজ্ঞাসা। এতক্ষণ জিজ্ঞাসা ছিল না ছিল বক্তৃতা। কুলক্ষয়কৃত দোষগুলি যখন অর্জুন বর্ণনা করছিলেন, তখন তিনি যে ওসব জনার্দনের চাইতেও বেশি বুঝেন, এইরকম মনে হচ্ছিল; এখন অর্জুন বুঝেছেন, তিনি অনেক কম বোঝেন।

ক্রমশঃ

"যখন বুঝতে পারবো যে, এই মরজগতের ভেতরেও একটা অমরত্বের সন্ধান আছে, তখন যাঁরা এই অমরত্বের আস্বাদন পেয়েছেন কিম্বা যাঁরা এই মরজগতে থেকেও অমর পথাশ্রয়ী হয়েছেন, তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করি। আমরা মনে করি তাঁরা আমাদের পথ দেখাতে পারবেন।"

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

"দেবী শ্যামাসুন্দরী'

শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়

আশ্বিনের সোনারোদে পুজোর বাদ্যি বেজে উঠেছে। চারিদিকে উলু-শঙ্খধ্বনির মাঝে মায়ের আগমনবার্তা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠেছে সুরলোক থেকে মর্ত্যলোকে। মায়ের আগমন মন্ত্র দিক হতে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে। শ্রীশ্রীগুরুচরণে অন্তরের প্রণাম জানিয়ে শুরু করছি—জাগ্রতা দেবী শ্যামাসুন্দরী মায়ের কাহিনী।

কথিত আছে ভক্তকে খালি হাতে ফেরান না মা শ্যামাসুন্দরী। তিনি নড়াচড়া করেন, ভক্তকে স্বপ্নাদেশ দেন। যখন যেটা মনে হয়, সেটাই করেন। মা এখানে জীবন্ত। ভক্তরা 'ধন্দে পড়ে যান, দেবী শ্যামাসুন্দরীকে তারা মহাজাগ্রত নাকি জীবন্ত বলবেন? কোথায় সেই মন্দির? খাস কোলকাতায় সুকিয়াস্ট্রীটের রামমোহন হলের পেছনের বাড়িতে এই মন্দির। মহালয়ার পুণ্যলগ্নে দেবীর আবির্ভাব তিথি। ঐদিন দেবী প্রথম দর্শন দিয়েছিলেন। মন্দির ঘিরে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে তা হল, একবার দেবীর পুজোর জন্য পুরোহিত বাজার করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এক পাঁচ বছরের বালিকা গায়ে কালো রং মেখে দেবী কালির মত সেজে সবার কাছে ভিক্ষে চাইছে। দেবী শ্যামাসুন্দরীর পুরোহিতের কাছেও সেই বালিকা ভিক্ষে চেয়েছিল। বলেছিল, যে একটা টাকা দিতে হবে যেহেতু সে দুদিন ধরে কিছু খায়নি। কিন্তু পুরোহিতের এইসব ভাল লাগেনি। তিনি ঐ বালিকাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন।—'যা কাজ করে খা'। জবাবে বালিকাটি বলেছিল, কাজ না পেয়েই সে ভিক্ষে চাইছে। এরপর ঐ বালিকা চলে গিয়েছিল। তারপর পুরোহিত দেবীর পুজোর জন্য, চাল, ডাল, কলা, মিষ্টি বাজার করে মন্দিরে ফিরে এসেছিলেন। দেবীর ভোগের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সেই দিনটি ছিল মহালয়ার ক্ষণ। এই মন্দিরের নিয়ম হল প্রতিটি অমবস্যায় অন্ধকারে দেবীর পুজো হয়। শুধুমাত্র দীপান্বিতা রাতে কালীপুজো হয় আলো জ্বালিয়ে। সেই রাতেও অমাবস্যায় দেবীর পুজো শুরু হয়েছিল। পুজো চলাকালীন পুরোহিত লক্ষ্য করেছিলেন যে মহাদেব শায়িত রয়েছেন। কিন্তু তাঁর দেবী কালীমূর্তি নেই। পুরোহিত প্রথমে ভেবেছিলেন, দেবীর রং কালো তাই অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এরপর ঘিয়ের প্রদীপ নিয়ে পুরোহিত দেবীর সামনে গিয়ে দেখলেন— সত্যিই দেবী কালীমূর্তি নেই। মহাদেবও মৃতমানুষের ন্যায় নিষ্প্রাণ হয়ে শুয়ে আছেন। এই অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখে পুরোহিত ভীষণ ভয় পেয়ে দু'পা পিছিয়ে আসেন। তিনি ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন। সেই সময়ই ছম ছম করে আওয়াজ হয়েছিল। পুরোহিত সেই নুপুরের শব্দে বুঝতে পেরেছিলেন কেউ যেন তাঁর পিছন দিক থেকে হেঁটে আসছেন। সেই সময় একটি পা যেন মহাদেবের বুকের ওপর ধপ করে পড়েছিল। সেই অন্ধকারের মধ্যেই দেবীর মুখ খুলে জিহ্বা বেরিয়ে এসেছিল। দেবী মানুষের কণ্ঠে বলেছিলেন, 'দে চাল কলা খেতে

দে। দিবিনা আমায়?' তাই দেখে পুরোহিত ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনি দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন— দেবী জানিয়েছিলেন, তিনি শুধু ধনীর মা নন, তিনি গরীবেরও মা। তাই দেবীর জন্য যে যতই বিশেষ পুজো করুক না কেন; কোনও ভক্ত একমুঠো আতপ চাল ও একটি পাকা কলা দিয়ে নিবেদন করলে সেটাতেই দেবী সন্তুষ্ট থাকেন। এরপর থেকে দেখা গিয়েছে, যে ভক্তই দেবীকে চাল-কলা নিবেদন করেছেন, দেবী তারই মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। শুধু তাই নয়—

দেবী শ্যামাসুন্দরীর কিছু প্রয়োজন হলে, তিনি আশপাশের বিক্রেতাদের স্বপ্নাদেশ দেন। সেই বিক্রেতারা স্বপ্নাদেশ পেয়ে সেইসব জিনিসপত্র এনে দেবীকে নিবেদন করে যান। কঠিন ব্যাধি থেকে জটিল সমস্যা—ভক্তদের দাবি, সবকিছুই দেবী শ্যামাসুন্দরী কৃপা করে অবলীলায় মেটান। অনেক ভক্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দর্শন দিয়ে আসেন এবং ডেকে নিয়ে আসেন বলে কথিত রয়েছে। একবার শ্যামাসুন্দরী মায়ের কাছে এসেছিলেন জনপ্রিয় গায়ক কেশব দে। এর আগে তিনি জীবন্ত কালীমায়ের দর্শনে এসেছিলেন তাঁর একটি গানের শ্যুটিং-এ। কিন্তু এবার তিনি সম্পূর্ণ অন্য কারণে মায়ের কাছে এসেছিলেন। এবার স্বয়ং মা তাঁকে ডেকে এনেছেন মায়ের দরবারে— অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। জীবন্ত কালীমায়ের সামনে বসে কেশব দে, 'থাকতে দিসরে মা', আর 'বল জয় মা কালীর জয়'-এই দুটি গান ভক্তিগীতি গেয়ে ছিলেন। আর গান শেষ হলে তিনি জানান যে, 'কিছু কারণে মা আমাদের অগোচরেই বলে দিলেন-তুই আমার কাছে আয়'। অর্থাৎ মা যে তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে ডেকে এনেছেন, তাই তিনি বোঝান। মা'কে শুধু ডাকার মত ডাকতে হবে।

আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানিনে মা'।
'ডাকার মত ডাকলে পরে,
মা কি দূরে থাকতে পারে।"

শুভ শারদীয়ার পুণ্যলগ্নে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে অন্তরের অনন্ত কোটি প্রণাম।

জয় শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী কী জয়

"সকল কাজে ভগবানকে দায়ভাগী করা একান্ত ভুল। সূর্যের আলোককে আশ্রয় করিয়া কেহ পাপাচরণ, কেহ বা পুণ্যকরে, সূর্য কিন্তু নির্বিকাররূপে উভয়কেই প্রকাশ করেন। তিনি পাপ-পুণ্যের দায়ভাগী হননা।"

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

পুণ্য-পরশ-পুলক (১৬শ পর্ব)

শ্রীবসুমিত্র মজুমদার

কি করে যে তিনি জীবনের রূপরেখা তৈরি করে দেন তা সত্যিই রহস্যময়। প্রথম প্রথম মনে মনে অভিযোগ করি; 'হায় ! তুমি এই করলে! পরে দেখা যায় তিনি কল্যাণই করেছেন। এমন একটা কথা এখুনি মনে পড়ছে। সেবার অফিসে প্রমোশনের জন্যে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই ট্রেনিংয়ের জন্যে মাস তিনেক সকাল আটটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত সেন্টারে থাকতে হবে। আর ট্রেনিং চলাকালীন কোনো ছুটি পাওয়া যাবে না। সেখানে আমারও যাবার কথা ছিল। কিন্তু কোনো রহস্যজনক কারণে আমার নামটা বাদ গেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বাড়িতে বাবা মা দুজনেই বললেন, 'গুরুমহারাজ যা করেন মঙ্গলের জন্যে'।

ইতিমধ্যে আমার বোনের বিয়ের ঠিক হল। বিয়ে হয়েও গেল। সব মিটে যাবার পর যখন একটু স্থিতু ভাবতে বসলাম, তখন দেখলাম, যদি আমি ট্রেনিং-এ যেতাম তা হলে বোনের বিয়েতে কোনো কাজ করা তো দূরের কথা, উপস্থিত থাকতেই পারতাম না। এমনকি বিয়ের জন্যে অফিস থেকে যে টাকা ঋণ নিয়েছিলাম, সেটাও সম্ভব হতো না। কাজেই তিনি যে কার কী ব্যবস্থা কখন কী ভাবে করে রাখেন তা বোঝা দায়।

আগেও বলেছি, ধানবাদে গুরুমহারাজ এলে আমাদের উৎসাহের অন্ত থাকতো না। সেবার কয়লানগরের কোয়াটার্সে গুরুমহারাজ এসেছেন। তাঁর জন্যে আমরা সবাই ব্যস্ত। শুধু কী তাঁর সেবা? সেই সঙ্গে তাঁর ভক্তশিষ্যমণ্ডলী, যাঁরা সঙ্গে আসতেন, তাঁদেরও সেবা করতে হতো। এটাই আমাদের ওপর কড়া নির্দেশ ছিল। কেন না, সবাই তখন কৃপা করে আমাদের আতিথ্য স্বীকার করেছেন। যে যাই করুন না কেন কারো ওপর অসন্তুষ্টি দেখানো চলবে না। এমনও হয়েছে গুরুমহারাজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কোনো শিষ্যা প্রসাদ খেয়ে হাত ধুয়েছেন- বিরক্ত হলেও তাঁকে কিছু না বলে পকেট থেকে রুমাল বার করে মেঝেটা মুছে নিয়েছি। কেন না, পাথরের মেঝেতে পা পিছলে যে কেউ পড়ে যেতে পারেন। একবার তো হয়েছিলও তাই। গুরুমহারাজের শ্রীচরণে আবির দিয়ে সেই আবির সোৎসাহে ভক্তগণের দিকে কোনো একজন ছুঁড়েছিলেন। তা ছড়িয়ে পড়েছিল সিঁড়ি জুড়ে। তার ঠিক পরে পরেই একজন মহিলা আসছিলেন গুরুমহারাজের নৈবেদ্য-সামগ্রী নিয়ে। আবিরে পা পিছলে তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সিঁড়ির ওপর। ছত্রাকার হয়ে পড়ে গেল নৈবেদ্য। কিছু রইল থালায়, কিছু ছিটকে পড়ল ইতস্তত। উপস্থিত সবাই চিৎকার করে উঠলেন, 'ওগুলো ফেলে দিন, নতুন করে ভোগ নিবেদন করুন। মাসী তাড়াতাড়ি করে নিজেকে সামলে নিয়ে সামনে পড়ে থাকা কিছু সামগ্রী থালায় তুলে নিয়ে রেখে এলেন গুরু মহারাজের ঘরে। দুপুরে প্রসাদের থালাবাসনগুলো বার করে আনার পর দেখা গেল, মাসী যেগুলো

কুড়িয়ে তুলেছিলেন, করুণার পাথার আমাদের গুরুমহারাজজী সেগুলো ছাড়া অন্যান্যগুলো থেকে কতক কতক তুলে নিয়েছেন।

যে কথা বলতে বসেছিলাম, সেটা বলি। আমাদের তখন একটা নতুন খেয়াল চেপেছিল সবার তাৎক্ষণিক মতামত সংগ্রহ করার। একটা ডাইরি যে কোনো লোকের সামনে ধরে বলতাম, 'যা ইচ্ছে লিখে দিন। তিনি প্রশ্ন করতেন, 'কী হবে?'; এর তো কোনো উত্তরই হয় না। ছেলেমানুষদের খেয়ালের কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়?

কী খেয়ালে দাদা ওই খাতা গুরু মহারাজের শয্যাসনের ওপর রেখে বলে এলেন, 'বাবা, একটা বাণী লিখে দেবেন।' সন্ধ্যে বেলায় দেখা গেল গুরুমহারাজ তাতে লিখেছেন- 'বাহুতে দাও গো সেবার শকতি/হৃদয়ে দাও হে অচলা ভকতি/ধ্যানে জেগে থাক মোহন মুরতি/কণ্ঠে তোমার গান।'

দাদাকে এমন একটা বাণী লিখে দিয়েছেন দেখে, আমার আর এক বোন সেই খাতা নিয়ে গুরুমহারাজের কাছে দিয়ে বললো, 'আমাকেও একটা বাণী লিখে দিন'। গুরুমহারাজ সেখানে লিখলেন, 'কারো প্রাণে যেন ব্যথা নাহি দিই/কারো প্রাণ যেন হরিয়া না নিই/নিখিল জনেরে আপন জানিয়া/ভালোবাসি ঢেলে প্রাণ।' বাণী পেয়ে তো সে নাচতে নাচতে চলে গেল। ছেলেমানুষরা তখন তার কোনো মানে বুঝতে পারে নি। মহারাজ লিখে দিয়েছেন এটাই কথা। আবার খানিক পরে আমাদের কথা হতে লাগল। এই গানই তো আমরা কীর্তনে গেয়েছি। আচ্ছা অন্য নতুন কিছুও তো লিখতে পারতেন!

আজ জীবনের প্রান্ত বেলায় এসে দেখছি, সেদিনই ওই দুজনের কর্তব্য গুরুমহারাজ স্থির করে দিয়েছিলেন। একজন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্কলার্শিপ, বিভিন্ন অনাথ ও বৃদ্ধাশ্রমে আহার্য ও সবজীর বীজ দানের ব্যবস্থা করে মানুষের সেবা করে চলেছেন। আর অপরজন মুমূর্ষু মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের যথাযথ চিকিৎসার পথ দেখিয়ে থাকেন। চেনা নেই জানা নেই সকলের জন্যেই তার মনের দরজা সব সময় খোলা। গুরুমহারাজের ইচ্ছায় দুজনেই আজ সেবায় আর ভালোবাসায় জনসেবাব্রতী।

(ক্রমশঃ)

"যে সব অবতারকল্প মহাপুরুষ তাঁর সহিত নির্বিকল্প সমাধিতে একীভূত হয়েছেন, তাঁরা জগতের কল্যাণের জন্য আবার যখন জগতের সঙ্গে ব্যবহারিক সংস্পর্শে আসেন, তখন তাঁরা যেখানেই যান সেখানেই তাঁর বার্তা বহন করে নিয়ে যান।"

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

স্মৃতির আলোকে বিগত দিন

শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র

আমাদের সময় শ্রীভগবানকে আমরা পেতাম দিনের মধ্যে বহু সময় আমাদের মধ্যে, আমাদের নাগালের মধ্যে। তখন প্রণাম ও কীর্তনের দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে দর্শনের যে আনন্দ, সেই আনন্দ প্রথম আনন্দ, অর্থাৎ মহারাজজীকে কেন্দ্র করে যে চিরস্থায়ী আনন্দ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আনন্দকে অতুলনীয় করে তুলত। সে সময় তাঁর সঙ্গে . কথা বলায় কোন নিষেধ ছিল না, শান্তভাবে প্রণাম করা সম্ভব হোত। তাড়াতাড়ি প্রণাম করার জন্য তাড়া দিতে কেউ থাকতো না।

সকল মিলন সফল তখন, আসন যখন তুমি লও।
সকল জীবন মিষ্ট তখন, তুমি যখন কথা কও।

এ ছাড়া সে সময় প্রণামের সময় তিনি কত কথা বলতেন, কত কৌতুক করতেন। সে সব দিনগুলি আজ স্বপ্ন কথা হয়ে গেছে। যে সব ভক্ত শিষ্য সেই সময়ের মিলিত আনন্দধারায় স্নাত হয়েছেন তাঁরা আজকের এই আংশিক আনন্দেতে কি করে তৃপ্ত হবেন? মনে হবে যেন আনন্দটা অপূর্ণ থেকে গেল। এর সঙ্গে মিলিত হোত অপর এক আনন্দ। সে সময়ে গুরুভাই গুরুভগিনীর সম্মেলনে যে আনন্দ পাওয়া যেত, সেটারও আজ অভাব বোধ হয়।

সে সময়ে আমাদের ধৈর্য ছিল, Discipline মেনে চলার অভ্যাস ছিল, বিবেকের অনুশাসন আমরা মেনে চলতাম, সেইভাবেই অভ্যস্থ ছিলাম। আমরা কখনও ভুলতাম না যে আমরা এসেছি এক মহামানবের শ্রীচরণে প্রণাম জানাতে যেখানে শিষ্টতা রক্ষাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

আজ আমরা discipline মানি না, মানার চেষ্টা করি না বা মানার ইচ্ছাও রাখি না। সে সময় যাঁরা আমাদের প্রত্যেকের জন্য discipline বজায় রাখতে সাহায্য করতেন, আমরা তাঁদের ব্যবস্থাকে মেনে নিতে অভ্যস্থ ছিলাম। কিন্তু আজ দেখি সেই মত ব্যবস্থা মেনে নিতে অনীহা আমাদের। কেন এমন হবে? কালের পরিবর্তন অনেক পরিবর্তন আনে কিন্তু মানুষের বিবেক কি পরিবর্তিত হয়ে যাবে? মহাপুরুষের শ্রীচরণে এসে ধৈর্য ধরতে হবে, শান্ত থাকতে হবে, শালীনতা বোধকে জাগ্রত রাখতে হবে। অবশ্য এই প্রণামের সময় যাঁরা ব্যবস্থাপনায় থাকেন তাঁদেরও হতে হবে সাধারণের প্রতি সুবিবেচক। তাঁদেরও ধৈর্য ধরা একান্ত প্রয়োজন। তাঁরাও এমন কোন ব্যবহার করবেন না যাতে সাধারণের বিরক্তি আসতে পারে বা ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে। তাঁদের সকলের প্রতি সম ব্যবহার করতে হবে। সেটাই কাম্য। কত সময় লক্ষ্য করেছি মহারাজজী তাঁদের ব্যবহার সংযত করতে বলছেন কি জানি আজকাল কালের হাওয়ায় হয়ত আমরা ভুলে গেছি আমাদের ভদ্রতা বোধ। অবশ্য এ সবই আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর কথা।

এই সব আনন্দের দিন আজ হারিয়ে গেছে। সে সব দিন আজ অতীতে পরিণত হয়েছে। এ সব

আনন্দের দিন আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

লিখতে লিখতে হঠাৎ মনে হয়েছিল পুরানো দিনের চিঠির ঝাঁপির কথা। কত চিঠিই পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে সারা জীবন ধরে। সব একসঙ্গে Compile করলে হয়ত একটা পুস্তক হয়ে যাবে। যাই হোক সেই পুরানো চিঠির ঝাঁপি নেড়ে দেখতে চেয়েছিলাম যদি সেই সব দিনের, যে দিন আজ অতীত, সেদিনের কোন ঘটনার সন্ধান পাই। খুলে দেখলাম রত্ন ভাণ্ডার পেয়ে গেছি। সে সময় ঠাকুর যে কত সহজভাবে একেবারে ঘরোয়া ভাবে ধরা দিয়েছিলেন তা পড়ে তাঁর কৃপার কথা ভেবে চোখ ভরে যাচ্ছে অশ্রুতে।

আশ্চর্য যে এই সব চিঠির কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। জানি না কার প্রেরণায় এই সব পুরানো চিঠির ঝাঁপি খুলতে ইচ্ছা হয়েছিল। তবে অবাক হয়ে ভেবেছি যে কি করে আমি এই সব চিঠির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তাঁর নগণ্য সেবক। স্মৃতির আলোকে 'তাঁর বিগত দিনের কথা লিখতে বসেছি। তিনি মহাপুরুষ। তাঁর লীলাখেলায় যে আমরাও অংশীদার ছিলাম, অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম, এ সৌভাগ্যের কথা কি করে ভুলে গিয়েছিলাম জানি না।'

পত্র পড়তে পড়তে অবাক হয়ে দেখলাম কত পত্রে রয়েছে তাঁর সাদর আবাহন তাঁর চরণে উপস্থিত হবার জন্য, তেমনি রয়েছে সেই আবাহন পালিত না হলে কত চিঠি তাঁর অভিমান ভরা ভাষায় লিখিত। এ সব পত্রের গুচ্ছ তো যত্ন করে তুলেই রেখেছিলাম। চিঠিগুলির বয়ান তো ভুলেই গিয়েছিলাম। সে সময় তাঁর সঙ্গে সে কি ঘরোয়া ভাবে আমরা ব্যবহার করতাম বা তাঁর কাছ থেকে আমরা কিরকম আন্তরিক ব্যবহার পেতাম, তা পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে এই সব পত্রের মাঝে আজ এই সব চিঠি পড়তে পড়তে চোখ জলে ভরে যাচ্ছে। ঠাকুর, এই অধমের উপর তোমার এত কৃপা, এত করুণা এ সৌভাগ্য কল্পনা করা যায় না। সারা জীবন তোমার চরণে কেটে গেল, শুধু নিয়েই গেলাম প্রতিদান তো কিছুই দিতে পারলাম না। তোমার চরণে হয়ত কত অন্যায় করেছি কিন্তু তোমার ক্ষমা পেয়ে এসেছি চিরকাল।

আজ যদি কাউকে এই চিঠিগুলির বয়ান মুখে জানাই সে হয়ত বিশ্বাসই করবে না। আমি নিজে এই পত্রগুলির প্রাপক না হলে হয়ত আমারও বিশ্বাস হোত না। এই সব চিঠি পাঠে সেদিনের সব কথা, তাঁর ব্যবহারের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, সেই সে দিনের আনন্দ ধারায় যেন সিঞ্চিত হচ্ছি।

সারা জীবন তাঁর স্বহস্ত লিখিত পত্র পেয়ে এসেছি তবে ইদানিং কিছুদিন অন্য লোকের হস্তাক্ষরে তাঁর উত্তর এসেছে। যে সময়ের চিঠির কথা উল্লেখ করছি, সে সময় তাঁর স্বরূপ বুঝি নি বা বোঝার চেষ্টাও করি নি, তাই সে সময় তাঁর কাছে ছিল না আমাদের কোন সঙ্কোচ বা কোন দ্বিধার ভাব। আমাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও বুঝতে দেয়নি আমাদের যে কত উচ্চ মার্গে তাঁর অবস্থান।

তাঁর প্রতি চিরকাল আমাদের অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি, সঙ্গে আছে একান্ত আপনজন হিসাবে অপার ভালবাসা। সে সময় সব কথা, সব আলোচনা, মনের ক্ষোভের কথা তাঁর সঙ্গে একান্ত আপন জনের মত করতে আমাদের মনে কোন দ্বিধা জাগতো না । সেইভাবেই আমরা অভ্যস্থ ছিলাম। অসম্ভব আকর্ষণ ছিল আমাদের, তাঁর প্রতি। সে সময় তাঁর সঙ্গ আমাদের কতটা আধ্যাত্মিক পথে চালিত করত মনে নেই, তবে তাঁর আকর্ষণে ভুলেছিলাম গৃহস্থ ধর্মের পালন, আত্মীয় স্বজনের সান্নিধ্য। মন শুধু চাইতো তাঁর দুর্লভ সঙ্গ। .

আজ জীবনের প্রান্তে বসে এই সব চিঠি পূর্বেকার কত মধুর স্মৃতি মনে জাগিয়ে তুলছে। এর পূর্বেই লিখেছি যে আমাদের একজন গুরু ভগিনী আমায় প্রশ্ন করেছিল—

"ভীষ্মদা! আপনি সব সময় বলেন বা রচনাতেও লিখেছেন যে সে আনন্দ আজ হারিয়ে গেছে। কেন? আজ কি মহারাজজীর কাছে আনন্দ কিছু কম আছে?"

পূর্বেই এর উত্তর আমি লিখেছি বটে তবে এই সব পত্রগুলি পাঠে মনে হোল, আরও কি আনন্দ বেশী উপভোগ করতাম সেটিও জানিয়ে যাই। মহারাজজী সদানন্দময় পুরুষ, তাঁকে ঘিরে সর্বদাই আনন্দ বিরাজ করছে। সে আনন্দ কি কোনদিন কম হতে পারে? প্রণামের মন্ত্রে আমি প্রথমেই তাঁকে স্মরণ করি সানন্দমানন্দরূপে—

নমঃ সানন্দমানন্দম্ মহান্তং ব্রহ্মণ্যমূর্তিং করুণাবতারম্
সঙ্কীর্তনব্যাজহতাঘপুঞ্জং শ্রীমোহনানন্দং গুরুং নমামি।

এই যে স্মরণ, প্রত্যেক দিন মহারাজজীর নির্দেশে গান শোনানোর আগে এই প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করতে আমি কোনদিন ভুলিনি। জানি না ঠাকুর আমার প্রণাম গ্রহণ করতেন কিনা, তবে আমার নামই দিয়ে দিয়েছিলেন 'সানন্দমানন্দম'। কীর্ত্তন আসরে আমাকে ডাকতে গেলেই বলতেন—

"কৈ, সানন্দমানন্দম কোথায় গেল?"

তাঁর এই যে কৌতুক, এও আমায় ধন্য করেছে।

আমি এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে ২/৪টি পত্র এখানে লিপিবদ্ধ করে যাব যাতে সেই গুরুভগিনী বা সম মনভাবাপন্ন অন্য কেউ যদি কখনও এ পুস্তক পাঠ করেন, বুঝতে পারবেন যে আমি কোন আনন্দের অভাব লিখেছি।

প্রথম পত্র দুটিতে সাদর আবাহন তাঁর চরণে হাজির হওয়ার জন্য। তৃতীয়টি তাঁর - আবাহনে সাড়া না দেওয়ার তাঁর অভিমান ভরা পত্রাঘাত। চতুর্থ পত্রটি আমার জীবনে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া প্রথম পত্র।

মহারাজজীকে ঘিরে যে আনন্দ চিরকালের, তার সঙ্গে যুক্ত হত যে সব আনন্দ, তার সঙ্গে যুক্তহোত যে সব আনন্দ, তার মধ্যে অন্যতম ছিল সে সময়ের গুরুভাইভগিনীদের সঙ্গ। আজ সে আনন্দের কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। আপন আপন অভীষ্ট পূরণ-অর্থাৎ কোনরকমে মহারাজজীকে একবার ঝাঁকি দর্শন ও পাদুকাতে মাথা ঠেকানো হলেই সকলে খুশী সে সময় কিন্তু আনন্দটা একটু অন্যভাবে পেতাম আমরা। তিনঘণ্টা মহারাজজীকে সর্বসময় দর্শন, চরণে প্রণাম, (পরে পাদুকায় প্রণাম আরম্ভ হয়েছিল) মহারাজজীর নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ, প্রণামের সময় এবং সর্বোপরি প্রত্যেক ভক্ত শিষ্য যেন প্রত্যেকের আত্মার আত্মীয় হয়ে গিয়েছিলেন।

মহারাজজী কীর্তন আসরে একদিন অনুপস্থিত হলেই পরদিন নানান প্রশ্ন, কেন অনুপস্থিত ছিলেন, প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে নিজেদের আত্মীয়ের চেয়ে আপন হয়ে গিয়েছিলাম। কারও অসুস্থতা বা শরীর খারাপের কথা জানতে পারলে সেই অসুস্থতা নিয়ে প্রত্যেকের চিন্তা। একেবারে একটা Family-র মতন। মহারাজজী যাঁর মধ্যমণি।

(ক্রমশঃ)

নমঃ শ্রীগুরবে

কাশীতে কয়েকটা দিন (দ্বিতীয় পর্ব)

শ্রীসোমনাথ সরকার

সংকটমোচন মন্দির থেকে বেরিয়ে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য কাশীর বিখ্যাত দুর্গামন্দির। অটো দুর্গামন্দিরের কিছুটা দূরে দাঁড়ালো। কাশীর সব মন্দিরের মত এখানেও পুলিশের ব্যারিকেড। মন্দিরের কাছ পর্যন্ত যেতে দিচ্ছে না। অটো থেকে নেমে একটু হেঁটে মন্দিরের দ্বারের পাশে পূজার উপকরণের দোকানে চটি জুতো রেখে ডালা নিলাম। মালা, এলাচদানার প্যাকেট, নারিকেল এবং লাল চুনরি।

ব্যাসদেব বিরচিত কাশীখণ্ডে কথিত আছে ভগবতী দেবী বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গম অসুরকে বধ করে ক্লান্ত হয়ে এখানে এসে তাঁর অসি (তলোয়ার) ছুঁড়ে ফেলে দেন। তাঁর ফেলে দেওয়া অসির আঘাতে মাটি দুভাগ হয়ে একটি নদীর সৃষ্টি হয়। অসির আঘাতে সৃষ্ট বলে সেই নদীর নাম হয় অসি। অসি নদীর এক পারে সংকটমোচন মন্দির। অপর পাশে দুর্গা মন্দির।

ক্লান্ত দেবী বলেন, 'দুর্গম অসুরকে বধ করার জন্য আমাকে আজ থেকে লোকে দুর্গা বলে ডাকবে। এটিই আমাদের দুর্গামন্দির। পাশের কুণ্ডটির নাম দুর্গা কুণ্ড। তার সৃষ্টি সম্পর্কে দু-তিনটি কাহিনী প্রচলিত আছে। আমি তা যাচাই করতে পারিনি বলে লিখলাম না।

মন্দিরে ঢোকার মুখে প্রবেশদ্বারের গায়ে শ্বেতপাথরের ওপর নির্দেশ লেখা আছে যে হিন্দুধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কারো এই মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। নাটমন্দির, গর্ভমন্দির সহ সমগ্র মন্দিরটি অপূর্ব লাল পাথরে তৈরী। আজ চৈত্র নবরাত্রির ষষ্ঠী। মন্দিরে বেশ ভীড়। মহিলা ও পুরুষদের আলাদা আলাদা লাইন।

লাল পাথরে তৈরী সুন্দর মন্দিরটি বঙ্গদেশের নাটোরের রাণী ভবানী ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী করিয়েছিলেন। মন্দিরে ঢুকে দেখি মায়ের দিকে মুখ করে বসে আছে পাথরের সিংহ। প্রবেশপথে মাথার ওপর ঘণ্টা। ভক্তেরা যাওয়ার পথে টং করে বাজিয়ে যাচ্ছে। নাটমন্দিরটি অনেকগুলো সোনালি সুন্দর কারুকার্য করা থামের ওপর দাঁড়িয়ে। গর্ভগৃহে মা দুর্গার শুধুমাত্র সোনার মুখটি দেখা যাচ্ছে। সর্বাঙ্গে লাল বস্ত্র আচ্ছাদিত। মাথায় সোনার মুকুট। লাল গোলাপের মালা, রজনী গন্ধা আর বেলপাতার মালায় মা কে সাজানো। মায়ের পূজা হয় যন্ত্রে। মায়ের বিগ্রহ পশ্চিমমুখী। নবরাত্রির চুতর্থীর দিন মা কে কুষ্মাণ্ডা রূপে পূজা করা হয়। ইনি কাশীর নবদুর্গার একজন।

কু মানে কুৎসিত। উষ্মা মানে তাপ। কুষ্মা অর্থাৎ খারাপ তাপ। অর্থাৎ ভক্তের যে ত্রিতাপ অর্থাৎ আধিভৌতিক, আদিবৈদিক ও আধ্যাত্মিক তাপ, তার দুঃখের কারণ হয়, মাকে আরাধনা করলে তা দূর হয়।

পূজারী মালা মা কে নিবেদন করলেন। প্রসাদ আর নারকেল ফেরত দিলেন। আমরা মন্দিরের গর্ভগৃহকে প্রদক্ষিণ করলাম। কুণ্ডের সিঁড়িতে বসে একজন নারকেল ফাটিয়ে দিচ্ছেন। মন্দিরের হবনকুণ্ডে হবন হচ্ছে দুর্গা কুণ্ডটি বর্তমানে কাশী পৌর নিগম মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। মধ্যস্থলে ফোয়ারা। ফলে তার যে প্রাচীন চেহারা ছিল তা এখন আর নেই। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন কাশী এখন একটু একটু করে আধুনিক হচ্ছে। কি জানি বর্তমান প্রজন্ম হয়ত তাই চায়। ঝাঁ চকচকে রাস্তা, একাধিক মল। স্বামী গম্ভীরানন্দের লেখা "যুগনায়ক বিবেকানন্দ" নামক স্বামীজির জীবনীগ্রন্থ থেকে জানতে পারি এই দুর্গামন্দির থেকে প্রত্যাবর্তন কালে একপাল বানর স্বামীজিকে তাড়া করেছিল। তাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য স্বামীজি পলায়ন করতে লাগলেও, তারা পিছু ছাড়ছিল না। তখন একজন সন্ন্যাসী চিৎকার করে বলেন—"থামো জানোয়ারদের সম্মুখে রুখে দাঁড়াও।" তদনুসারে স্বামীজি রুখে দাঁড়ালে বানরগুলো পলায়ন করে। সেই সময় দুর্গামন্দির সংলগ্ন অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল।

পরবর্তীকালে আমেরিকায় বক্তৃতা প্রদানকালে স্বামীজি এই ঘটনার উল্লেখ করে শ্রোতাদের বলতেন—প্রকৃতির সম্মুখে, অবিদ্যার সম্মুখে, মায়ার সম্মুখে পলায়ন না করে রুখে দাঁড়াতে।

দুর্গামন্দির থেকে বেরিয়ে অটো নিয়ে এলাম শিবালা। প্রধান রাস্তার মোড়ে অটো ছেড়ে দিয়ে আমরা গলি দিয়ে এলাম আমাদের আশ্রম শ্রীশ্রীবালানন্দ তীর্থাশ্রমে।

আগামীকাল থেকে যজ্ঞ শুরু হবে। তাই আশ্রম সাজানো হয়েছে। নতুন রং করা হয়েছে। টুনি লাইট, ফুলের চেন দিয়ে আশ্রম সাজানো। বাহিরের প্রাঙ্গনে ভাণ্ডারার জন্য শেড দিয়ে বেঞ্চি ও টেবিল পাতা।

ভিতরে মন্দিরে পূজারী ও কয়েকটি অল্পবয়স্ক বিদ্যার্থী মিলে শিবের রুদ্রাভিষেক করছে।

কাল থেকে যে যজ্ঞ শুরু হবে ভিতরে মণ্ডপ করে তার প্রস্তুতি সাজানো রয়েছে। মধ্যস্থলে যজ্ঞদেবী। চার কোনায় নানা রং দিয়ে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল আঁকা রয়েছে। এক পাশে প্রচুর কাঠ যজ্ঞ উপলক্ষ্যে জড়ো করে রাখা আছে। বস্তা করে তিল রাখা আছে।

অনেকগুলো পেতলের কলসি, কিছু আমপাতা, কয়েকটা প্লাস্টিকের জ্যারিকেন ভর্তি গঙ্গাজল, ঘি এর শিশি, মধুর শিশি, লাল হলুদ সুতোর একটা লেছি, একটা নতুন লাল শালুর গাঁট রাখা রয়েছে। বরণের থালার মত একটা বড় থালায় পূজার সামগ্রী সাজানো রয়েছে। যজ্ঞ করবেন শ্রীশ্রীসম্বিদানন্দ ব্রহ্মচারীজী।

আমরা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর ঘরে গিয়ে পাদুকায় প্রণাম করলাম। সুন্দর করে ঘরটি সাজানো। গুরুমহারাজের ছবির সামনে টেবিলের উপর একটা গ্লাসে করে খাবার জল ঢাকা দিয়ে রাখা আছে।

বিছানাটি টানটান করে পাতা। তার ওপর দুটি বালিসে হেলান দিয়ে রাখা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের একটি ছবি। তাতে লাল গোলাপের মালা।

সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম ৺শ্রীশ্রীবিশ্বাত্মানন্দজীর ঘরে। বিছানায় বালিসে হেলান দিয়ে রাখা ৺বিশ্বাত্মানন্দজীর ছবি। তাতে গেরুয়া উত্তরীয় পরাণো। ছবিতে লাল গোলাপের মালা পরাণো। দুপাশে দুটো ধপধপে সাদা তাকিয়া। ছবির সামনে তাঁর পাঠের বইগুলো রাখা আছে। মাথার উপর একপাশে গুরুমহারাজের ছবি। অপর পাশে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। ঘরের এক পাশে Tread Mill অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

আমার স্ত্রী মন্দিরে ষষ্ঠীর দিনে পুজো দেবে বলে সকাল থেকে কিছু না খেয়ে আছে শুধু শিবালার মোড়ে এক কাপ দুধ চা ছাড়া। তাকে কিছু খাওয়ানো দরকার।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে শিবালার মোড়ে এসে একটা অটো ধরলাম। অটো আমাদের জঙ্গমবাড়ীর কাছে নামিয়ে দিল।

"অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী
শিবধন্য কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী।।
ভাগীরথী বিরাজিত হয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি।
উত্তরবাহিনী গঙ্গা, জল চলেছে দিবানিশি।
শিবের ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টিত বরুণা অসি।
তন্মধ্যে মরিলে জীব, শিবের শরীরে মিশি।।
কী মহিমা অন্নপূর্ণার, কেউ থাকে না উপবাসী,
ওমা—রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার চরণধুলার অভিলাষী।।"

সাধক রামপ্রসাদের মনে আছে কাশী শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত। কথায় বলে কাশীধাম "কামারি শূলাগ্রস্থিত"।

কামারি অর্থাৎ কামদেবের অরি অর্থাৎ মদনকে ভস্মকারী শিব এই কাশীকে তাঁর ত্রিশূলের উপর ধারণ করে আছেন। এটা বেশ বোঝা গেল যখন আমাদের শিবালা আশ্রম থেকে বের হয়ে অটো ধরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে অর্থাৎ গোধুলিয়া হয়ে কালভৈরবের দিকে চললাম।

কেদার মন্দিরের কাছে ত্রিশূলের দক্ষিণ ফলার উপর অবস্থিত। এটা বেশ বোঝা যায় অটো বা রিক্সা যখন উঁচুতে উঠছে। যাঁরা কেদারের ঘাটে সিঁড়ি দিয়ে গঙ্গায় নেমেছেন তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন সিঁড়িগুলো কি খাড়াই। তারপর আস্তে আস্তে নেমে গিয়েছে গোধুলিয়ার দিকে। তারপর মধ্যফলায় বিশ্বনাথ মন্দির। এটা বোঝা যায় মনিকর্ণিকার কাছে কাশী করিডোরের ঘাটের সিঁড়িগুলো দেখলে।

তারপর আবার গোধুলিয়া থেকে রিক্সা করে কালভৈরবের মন্দিরের দিকে গেলে কিছুটা নিচু হয়ে ফের উঁচু হয়েছে। শেষ ফলাটি কালভৈরবের মন্দিরের নিচে।

বিশ্বনাথ মধ্য ফলায়, কেদার মন্দির দক্ষিণ ফলায়, কালভৈরব উত্তর ফলায়।

"শাক্ত ও বৈষ্ণবের সম্মিলিত রূপ দেবী কালী-কৃষ্ণ"

শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

শাস্ত্রে কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধার সঙ্গে লীলা খেলায় মত্ত ছিলেন তখন সেই খবর জটিলা-কুটিলার মারফত পেয়ে যান রাধিকার স্বামী আয়ান ঘোষ। আয়ান ঘোষ জানতেন শ্রীকৃষ্ণের সাথে রাধা গোপনে প্রেম লীলা খেলা করেন। এখানে বলা বাহুল্য যে রাধা কৃষ্ণের এই প্রেমলীলা নিষ্কাম এবং নিঃসন্দেহে স্বর্গীয়। এই প্রেমলীলা সংবাদ পাওয়া মাত্র হাতেনাতে রাধাকে ধরার জন্য সেখানে তিনি উপস্থিত হন। অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারেন। তিনি তখন তার প্রেয়সীকে বলেন আমি কালীরূপ ধারণ করছি। তুমি আমার পূজা করো। আয়ান ঘোষ ছিলেন পরম কালী ভক্ত। প্রেয়সীকে বাঁচাতে শ্রীকৃষ্ণ কালী রূপ ধারণ করেছিলেন। তার থেকে উৎপত্তি হয় দেবী রটন্তী কালীর। রাধিকার স্বামী আয়ান ঘোষ এসে দেখলেন যে রাধিকা তার আরাধ্য দেবী মা কালীর পূজা করছেন । তাই দেখে তিনি সেখান থেকে খুশি মনে চলে যান।

হুগলি জেলার শ্রীপতিপুরের অধিকারী পরিবারে কালী কৃষ্ণের পুজো শুরু করেন বটকৃষ্ণ অধিকারী। গ্রামের এক দরিদ্র বৈষ্ণব পরিবারে বটকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। আচার আচরণে বটকৃষ্ণ বৈষ্ণব ছিলেন। লেখাপড়া শিখে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি ভিন দেশে চাকরি করতে চলে যান। কিন্তু ভাগ্য মন্দ। সেখানে কিছুদিন পরে নিজ গৃহে ফিরে আসেন। সংসারী বটকৃষ্ণ বৈষ্ণব হলেও তাঁর অন্তরে টান ছিল তন্ত্রের উপর। ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য তিনি শ্মশানে গিয়ে তন্ত্র সাধনা শুরু করেন এবং সিদ্ধি লাভও করেন। দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হয়ে তন্ত্রসাধক সিদ্ধ পুরুষ বটকৃষ্ণ নিজের বাড়িতে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বৈষ্ণব হয়ে বাড়িতে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করা সে সময় খুব সহজ সাধ্য ছিল না। কারণ পরম বৈষ্ণব হয়ে বাড়িতে কালীর উপাসনা ছিল প্রচণ্ড অপরাধ। বটকৃষ্ণের এ হেন আচরণ সেকালের সমাজপতিরা ভাল মনে গ্রহণ করেননি বরং তার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন। তথাপি মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে বটকৃষ্ণ সমাজপতিদের বিরুদ্ধাচরণকে তোয়াক্কা না করে বাড়িতে কালীমন্দির স্থাপন করেন ও মায়ের মূর্তি করে রটন্তীকালী পুজোর দিন পুজোও করেন। এক জায়গায় এই দেবী প্রতিমার বর্ণনা যা পাওয়া যায় তা হল দেবীর গায়ের রং সবুজ, গলায় কণ্ঠীর মালা ও বৈষ্ণব তিলক আঁকা। দেবি এখানে উগ্র কালী করালী মূর্তি সম্পন্না নন বরং শান্ত বৈষ্ণবীর প্রতিমূর্তি বৈষ্ণব ধর্মালম্বী। এই মা, জীব বলিদানে খুশি নন বরং মা খুশি হন শ্রীকৃষ্ণের মিষ্টি মধুর বংশী ধ্বনিতে।

দীর্ঘদিন ধরে আমি বহরমপুর দেবায়তন মন্দিরে বা পরমপুরুষ শ্রীশ্রী গুরু মোহনানন্দজীর আশ্রমে যাতায়াতের সুবাদে গুরু মহারাজ প্রতিষ্ঠিত দেবী কালী প্রতিমাটির অনুরূপ মূর্তি দর্শন করি ও আমার মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় তখন। স্বামী মোহনানন্দ মহারাজ একাধারে ছিলেন পরম বৈষ্ণব আবার তন্ত্রেও বিশ্বাসী।

শুধু তাই নয় তিনি ছিলেন একজন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ (ইং ১৯০৪--১৯৯৯)। তিনি রাম নিবাস ব্রহ্মচর্য আশ্রম, দেওঘরের দ্বিতীয় প্রধান মোহন্ত ছিলেন। তিনি দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীবলানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম একজন।

গুরুর প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি জীবনে অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেওঘরে পূজা ও যজ্ঞ শুরু করেছিলেন। যেমন দুর্গা পূজা, শ্রীশ্রী বড়ো গুরু মহারাজ এর আবির্ভাব তিথির জন্য দোল পূর্ণিমা যজ্ঞ, কালীপূজা, অন্নকূট এবং এই ধরণের বিভিন্ন অনুষ্ঠান। তিনি পরম বৈষ্ণব হয়েও তন্ত্র বিশ্বাসী ছিলেন বলেই কালী-কৃষ্ণে বিভেদ করেননি। সেই জন্য কালীপূজা তাঁর সাধনার একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল। এইসব বিভিন্ন ধর্মীয় মন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্যে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হল হিন্দুদের সনাতন ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা ও বিশ্বের সমগ্র মানবজাতিকে শান্তি ও দেবত্বের জন্য একটি স্থান প্রদান করা। যার জন্য তিনি বদ্রীনাথের প্রচণ্ড শীতল তাপমাত্রা ও উচ্চতাকে ভালবাসতেন। বদ্রীনাথ আশ্রমে তিনি ২৪ বছর ধরে বিষ্ণু লক্ষ্মীর যজ্ঞ করেন। ঐ একইভাবে তিনি বেনারসে রুদ্র যজ্ঞ ও শিব-শক্তি যজ্ঞ করেন। তাঁর স্থাপিত আশ্রম ও মন্দিরগুলো আজ হাজার হাজার ভক্ত শিষ্যদের সান্ত্বনা ও শান্তির আবাসস্থল। মানবজাতির প্রতি শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের অবিচ্ছিন্ন স্নেহ ও মমতা ছিল। প্রকৃত অর্থে তিনি সকলের পিতার ন্যায় ধরাধামে পূজিত হন। তিনি ছিলেন মানবতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর সাধনার মূল রূপটি ছিল বৈষ্ণব ও তন্ত্রের সম্মিলিত রূপের সাধনা। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে সমগ্র মানবজাতিকে দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণাগ্রস্তদের প্রশান্তি দান করেছিলেন তেমনি শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ শ্রী শ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী রূপে ধরায় অবতীর্ণ হয়ে মানুষকে মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও ধর্মকে অবলম্বন করে ধর্মীয় পথে মানুষকে প্রেমদান করে ও ভালোবেসে মানবজাতির কল্যাণের জন্য জীবন অতিবাহিত করে সমগ্র ভারতে ও বিদেশে শ্রদ্ধেয় সকল সাধু মহাপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠেন।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

"সূর্য ও তাঁর প্রভা, প্রদীপ ও তার আলো অভিন্ন, সেইরূপই শ্রীনামই হলেন কৃষ্ণস্বরূপ এবং নামই আবার রসমূর্তি।"

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ।

বৃক্ষদেবতা (১)

শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক

আজ এই আষাঢ় মাসে যখন লিখতে বসেছি তখন চারদিকে বৃক্ষরোপণের সমারোহ। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বহুতল বাড়ি সকলেই এই উৎসবে মেতে উঠেছে। একি কেবল এ যুগের মাতামাতি, না কি আগেও ছিল? বই পত্র নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতেই বেরিয়ে আসে নানা তথ্য।

পুরাকালেও মুনিঋষিরা পরিবেশ ও তরুলতাদির প্রয়োজন বিষয়ে যথেষ্টই সচেতন ছিলেন, তাঁরা জানতেন বাড়ির কোন দিকে কোন গাছ লাগানো ভাল, আর আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তো গাছ গাছালির অসীম ওষধি গুণের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ চিকিৎসক জীবক বলেছেন যে এ পৃথিবীতে প্রতিটি তরুলতা, গুল্ম, তৃণ কোন না কোন ওষধিগুণে পূর্ণ। আমি এ বিষয়ে আর আলোচনা করছিনা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গাছের ভূমিকা নিয়ে বাস্তু ও পুরাণকারদের মতামত জানাচ্ছি, সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, যে কোন বাড়ির উত্তরে প্লক্ষ বা পাকুড়, দক্ষিণে ডুমুর, পূর্বে বট ও পশ্চিমে অশ্বত্থ গাছ লাগানো শুভ। বছরের কোন সময় গাছ লাগানো শুভ, কোন গাছে কতটুকু জল দেওয়া প্রয়োজন সে বিষয়েও তারা সুপরামর্শ দিয়েছেন। বাড়ির বামভাগে বাগান করাকেই তাঁরা প্রশস্ত বলে মনে করেন, পুরাণ বা বাস্তুশাস্ত্র নয় আমাদের সংস্কৃত কাব্য উপন্যাসেও তরুলতাদি সবসময়ই এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, বিশেষ করে কালিদাস কাব্যে তারা যেন মানুষের সঙ্গে মিশে গেছে। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে দুর্গের বর্ণনা গিয়ে সবুজায়নের দিকে বিশেষ জোর দিয়েছেন, সাধারণের বসবাসভূমির চারদিকে ফল ও ফুলবাগানে (পুষ্প-ফলবাট) সৃষ্টির জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিশেষভাবে বলে গেছেন কোন জমিই যেন পতিত না থাকে, যে জমিতে অন্য কোন গাছ জন্মায়না সেখানেও যেন তৃণভোজী প্রাণীদের উপযুক্ত ঘাস লাগানো হয়, অর্থাৎ কোন জমিকেই এমনি ফেলে রাখা যাবে না।

আগ্নেয় পুরাণে গাছের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে তরু, লতা, গুল্ম, বল্লী, ত্বক্সার ও তৃণ এই ছরকমের গাছ হয় যা থেকে দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর, পশু, পাখী মানুষ সকলেই উপকার পেয়ে থাকেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় দেবপুজোয় লাগে ফুল, পাতা, ফল, পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে ফলদান করা হয়, মানুষ সুশীতল ছায়াতলে বিশ্রাম লাভ করে, পাখী গাছে বাসা বাঁধে ও ফল খেয়ে জীবনধারণ করে।

এবার বাস্তুমণ্ডন নামে একটি বাস্তুশাস্ত্র থেকে বলি, এই বইটি রাজস্থান অঞ্চলে লেখা। এতে আবার বলছে— আম, অশ্বত্থ, বট, পাকুড় ডুমুর প্রভৃতি বড় বড় গাছ কখনো বাড়ির কাছাকাছি লাগানো উচিৎ নয়, কারণ হিসেবে তাঁরা দেখিয়েছেন যে ভবিষ্যতে বাড়ি বাড়াতে হলে এরা বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তবে এদের বাড়ির সীমানায় লাগানো বাড়ির কাছাকাছি কি গাছ লাগাবো' করবী, মুমি, দ্রাক্ষা জাতি, তগরু,

কুব্জিকা, চাঁপা, পুন্নাগ, এ ধরণের দেবভোগ্য গাছকেই লাগাতে বলেছেন তাঁরা। এছাড়া বেল, বকুল জাতীয় গাছও লাগানো যেতে পারে।

কোনও গাছ, লতা, বা ঝোপ ঝাড় লাগানোর আগে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে তারা যেন কোনভাবেই সেই বাড়িটির ওপর আড়াই বা তিন ঘণ্টার বেশী ছায়া বিস্তার না করে।

শহর নির্মাণের সময় বাস্তুকারেরা উদ্যান বা প্রমোদবনের কথা বারবারই উল্লেখ করেছেন। নগর পরিকল্পনায় উদ্যানের ওপর বিশষ জোর দেওয়া হয়েছে।

আগ্নেয় পুরাণে আবারও বলা হয়েছে পত্র, পুষ্প, ফল মূল, ছায়া, ত্বক্, কাঠ-এসবই গাছ পরের জন্য অকাতরে দান করে, এতে সে কোন ভেদাভেদ করে না। উপকারী, অপকারী সকলের প্রতিই তার সমভাব, তাদের এই আচরণ হিংসা দ্বেষ বর্জিত মুনি ঋষিদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পরিশেষে আগ্নেয় পুরাণ একথাও লিখেছে যে অপুত্রক দম্পতির কাছে একটি গাছই বংশপরম্পরায় শতপুত্রের কাজ করে।

ANNOUNCEMENT

Sri Sri Balananda Trust,
Ram Niwas Brahmacharya Ashram,
P.O. Karnibad,
Baidyanathdham,
Deoghar, Jharkhand,
PIN Code- 814143.

Change of Bank Account:

Donation to be sent to:
State Bank of India,
Deoghar,
Court Road, Deoghar,
District: Deoghar, Jharkhand,
Pin Code-814112

Savings Bank Account No. : 11240654640
Branch Code: 64
Branch E-mail: sbi.00064@sbi.co.in
IFS Code: SBIN0000064
MICR Code: 814002102
CIF No.: 81008849113

প্রার্থনা (পূর্বে-প্রকাশিত)

শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়

তোমার জগৎজোড়া মানুষগড়ার কর্মশালার মাঝে
আমায় শুধু লাগিয়ে রেখো এমন কোনো কাজে—
যে কাজ আমায় সাজে।
প্রথমসারির কর্মী যারা
শক্তিবলেই যোগ্য তারা,
দুর্বলেরা সেই গুরুভার বইতে পারে না যে!

সামর্থ্য যার খুব বেশী নয়
দাও তারে ভার, যে টুকু সয়—
কর্ম, শক্তি— সব যে তোমার
তুমিই সর্বগুণের আধার,
তুমিই জানো কার ভিতরে কোন ক্ষমতা আছে।

দশাননের নিধনহেতু
শ্রীরামচন্দ্র বাঁধেন সেতু,
কাঠ বিড়ালী ক্ষুদ্র হলেও পিছিয়ে না যায় লাজে।
সামর্থ তার হোক সীমিত
প্রভুর কাজে নয় সে ভীত,
ছোট্ট প্রাণীর বুকেও যে তাই বিজয় ডঙ্কা বাজে।

কাঠবিড়ালীর মতোই আমি
তোমার কাজেই লাগবো, স্বামী—
সারির শেষে সবার পিছে, তোমার মনের কাছে
আমায় শুধু লাগিয়ো তোমার এমন কোনো কাজে
যে-কাজ আমায় সাজে।

আনন্দদায়ক সুখদায়ক

স্বামী শিবানন্দ গিরি

একটা লটারী জেতবার পর টিকিটটা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পুরস্কারের টাকাটা এখনো হাতে আসেনি। বিশ্বাস হচ্ছে না লটারীতে আমার টিকিটটা উঠেছে, আমি প্রচুর টাকা পেয়েছি। টাকাটা যতক্ষণ হাতে না পাচ্ছি ছটফট করছি। আধ্যাত্মিক জীবনেও এরকম সমস্যা দেখা দেয়, এমন একটা অনুভূতি। কি যেন একটা পেয়েছি, অথচ ঠিক যেন বুঝতে পারছিনা, ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

যে বস্তুটি লাভ করার চেষ্টা করছো, সে বস্তুটি কেমন? পেয়েছি কিন্তু তার মধ্যে না পাওয়া রয়েছে। এরকম একটা অনুভূতি হয়। তুমি সর্বত্র ভগবানের কথা বলো কিন্তু মহল করেন, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শুধু মাত্র মূর্খের জন্য বিদ্বান বুদ্ধিমানের জন্য নয়।

চোখ বুজে নাম করছো, চোখ খুলে ছবি দেখছো, চন্দন পড়াচ্ছো, প্রণাম করছো। তোমার জীবনে এটা সুখদায়ক, সুখ প্রদায়ক। করতে ভালো লাগছে, করে আনন্দ পাচ্ছ। সুখ আনন্দ এক নয়। এ জীবনে খানিকক্ষণের জন্যে কিছু পাওয়া, একটু আরাম, একটু তৃপ্তি। ক্ষণস্থায়ী কিছু পাওয়া সেটা সুখ পদবাচ্য। আনন্দ স্থায়ী বস্তু। ভগবানের পূজার মধ্যে, নামের মধ্যে, বেঁচে থাকার মধ্যে সবাই সুখ চাইছি। গীতায় বারবার 'সুখ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'আনন্দ' উচ্চারণ করা হয়নি। আনন্দ যখন ভেতরে আসবে তখন মনে হবে আমি ধন্য। কোন কোন সুখ পেলেও মনে হয় আমি ধন্য। খেয়ে সুখ, পেয়ে সুখ, নিয়ে সুখ, দিয়ে সুখ। কিন্তু সুখের শেষে 'খ' আসছে, দুঃখ রেখে যায়। আনন্দের শেষে 'নন্দ' আছে। নন্দদুলালকে মনে করিয়ে দেয়।

যারা সুখ চায়, আর যারা আনন্দ চায় এক জাতের মানুষ নয়। উচ্চ কণ্ঠে বলো আনন্দের জন্যে এসেছি। আনন্দ চাই। তুমি যে আনন্দ পেয়েছ, পাচ্ছ প্রকৃতি তার চিহ্ন রেখে দেয়। পূর্ণতার চিহ্ন। পরিপূর্ণতার ছাপ রেখে দেয়। সুখ না আনন্দ ছাপ দেওয়া আছে। চিনতে চেষ্টা করলে চিনতে পারবে। আনন্দের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাবে। জীবনের সার্থকতাকে খুঁজে পাবে। কথা বলতে বলতে, শুনতে শুনতে, নাম করতে করতে, গান গাইতে গাইতে আনন্দ পাচ্ছ। সুখদায়ক, আনন্দদায়ক এক নয়। আনন্দ হলে মনে হবে ধন্য হলাম, পূর্ণ হলাম, নিজেকে খুঁজে পেলাম।

প্রশ্ন করেছ ভগবানকে কি পাওয়া যায়, না যায় না? পূজা, নাম, ধ্যান, জপ করছ তবু তাঁর দেখা পাচ্ছি না কেন? দেখা পাওয়াটা শেষ নয়, শুরুও নয়। এ জীবনে তাঁকে না পাওয়ার দুঃখ যন্ত্রণা ততটা নয়, তাঁর দেখা পেলে যন্ত্রণাকে যতটা জানা যায়। সে যন্ত্রণার নামে ভালোবাসা। ভালোবাসা আনন্দ আনে, শুধু সুখদায়ক বস্তু নয়। পূজা, নাম, ধ্যান, জপ করার মধ্যে আনন্দ পাচ্ছ কিনা বড় কথা। আনন্দ পেলে অমনি মনে হবে আমি ধন্য, আমি সার্থক, আমি আমাকে খুঁজে পাচ্ছি, আমি আমার ভূমিকাকে

বুঝতে পারছি। তখন নিশ্চিত জানতে পারবে সেই ভুমাকে, যে দেখা না দেখা দুই কূলকে ছুঁয়ে তোমার নদীর খাত বেয়ে চলেছে। নিজেকে পেলে তাকে পাওয়া বাকী থাকে না। ;

এটা নিশ্চিত, আমার কথা, তোমার কথা, তোমার কথা আমার কথা। যে এ অনুভূতিতে এসে পৌঁছেছে সে আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি করেছে। তাঁর কথা বলতে গেলে নিজের কথা বলে ফেলে, আলাদা করে ভাবে না। তোমার সত্যিকারের পরিচয় আমি এবং আমার সত্যিকারের পরিচয় তুমি। তুমি কি ভাবছো, তুমি আমি আলাদা? নিজের কথা ভালো করে বুঝলে তোমার কথা বোঝা হয়। তুমি নতুন করে কিছু বলোনা, আমিও নতুন করে কিছু বলিনা। তুমিই আমি, আমিই তুমি। তোমার সঙ্গে আমার লীলাখেলা, দুঃখ নিবেদন করা, তোমার দুঃখ আমার অন্তরে বাজে। আমার কথা বললে, তোমার কথা বলা হয়। নিজের কথা খুব বলো তাহলে দেখবে তাঁর কথাও এসে যাচ্ছে। তাই কথামৃত এত ভালবাসি ওতে তোমার কথা আমার কথা মিলে যায়।

আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে নিরবিচ্ছিন্ন, বিরতিহীন স্পন্দন। ওই স্পন্দন তোমাকে স্পন্দিত করছে। মানুষ তার মধ্যে নিজেকে চিনে নিচ্ছে। সবচেয়ে বিস্ময় আমার স্পন্দন ওনার মধ্যে রয়েছে। ওই স্পন্দনে আমার বেদনা বেজে ওঠে, জানা মাত্র আমার আনন্দ হল। যে আনন্দের অর্থ জীবনকে খুঁজে পাওয়া, জীবন ধন্য হওয়া। আমি যে আনন্দ দিতে চাই, সুখ নয়।

"তিনিই (মহাশক্তি) সনাতনী শক্তিভূতা, গুণাশ্রয় ও গুণময়ী; আমরা তাঁরই অমৃতময় ক্রোড়ে নিত্য লালিতপালিত সম্বর্দ্ধিত, আবার তাঁরই ক্রোড়ে মৃত্যুশয়নে শায়িত।"

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমূহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী

২০২৪ সাল	১৪৩১ সন	উপলক্ষ্য
৩রা অক্টোবর	১৬ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ, ঘটস্থাপন ও নবরাত্রি ব্রতারম্ভ।
৮ই অক্টোবর	২১শে আশ্বিন, মঙ্গলবার।	শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর শুক্লাপঞ্চমী বিহিত পূজা প্রশস্তা সায়ং কালে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর বোধন।
৯ই অক্টোবর	২২শে আশ্বিন, বুধবার	মহাষষ্ঠী, শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর ষষ্ঠীবিহিত পূজা প্রশস্তা। সায়ংকালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস।
১০ই অক্টোবর	২৩শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার	শ্রীশ্রীদুর্গামহাসপ্তমী। শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন ও সপ্তমীবিহিত পূজা প্রশস্তা।
১১ই অক্টোবর	২৪শে আশ্বিন, শুক্রবার	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর ঘ: ৬।২২।৫৮ সে: মধ্যে মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। **সন্ধিপূজা:** ঘ: ৬।২২।৫৮ থেকে সন্ধিপূজারম্ভ। ঘ: ৬।৪৬।৫৮ থেকে বলিদান। ঘ: ৭।১০।৫৮ সে: মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন। সন্ধিপূজা সমাপনান্তে ঘ: ৭।১০।৫৮ থেকে পূর্বাহ্ন ঘ: ৯।২৬।৫৬ সে: মধ্যে কিন্তু বারবেলা অনুরোধে ঘ: ৮।২৮।৪৫ সে: মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর মহানবমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীযজ্ঞ ও পূর্ণাহুতি। *বি: দ্র: গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকামতে।*
১২ই অক্টোবর	২৫শে আশ্বিন শনিবার	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর প্রাতঃ ঘ: ৫।৪২।৩৮ মধ্যে শুক্লা মহানবমী বিহিত অধিকপূজা। ঘ: ৭।১।৪৭ থেকে পূর্বাহ্ন মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর দশমী বিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জন প্রশস্তা। বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা। বিজয়া দশমী কৃত্য। দুর্গাপুর আশ্রমেও এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।
১৬ই অক্টোবর	২৯শে আশ্বিন বুধবার	রাত্রি ঘ: ৭।৪২।৩৬ থেকে শ্রীশ্রীকোজাগরী ৺লক্ষ্মীপূজা ও শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতপূজা দেওঘর আশ্রম ও পুরী তীর্থাশ্রমে অনুষ্ঠিত হইবে।
৩১ অক্টোবর	১৪ই কার্তিক বৃহস্পতিবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা মহোৎসব ও ভাণ্ডারা।
২রা নভেম্বর	১৬ই কার্তিক শনিবার	দেওঘর আশ্রমে অন্নকূট মহোৎসব ও ভাণ্ডারা।
১০ই নভেম্বর	২৪শে কার্তিক রবিবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা ও ভাণ্ডারা।

২০২৪ সাল	১৪৩১ সন	উপলক্ষ্য
১০ই ডিসেম্বর	২৪শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর ১২১তম শুভাবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা, সাধুভাণ্ডারা ও কম্বল দান, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শীতবস্ত্র বিতরণ। জামিরলেনসহ অন্য সকল আশ্রমেও জন্মতিথি উৎসব পালিত হইবে
২০২৫ সাল	**১৪৩১ সন**	উপলক্ষ্য
১লা জানুয়ারী	১৬ই পৌষ, বুধবার	ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষ্যে কলিকাতাস্থিত জামির লেন, শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর বিশেষ পূজা, অভিষেক ও প্রসাদ বিতরণ।
৩রা ফেব্রুয়ারী	২০শে মাঘ, সোমবার	দেওঘর আশ্রমে শুভ বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে ৺শ্রীশ্রীবালা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীমাতার বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা ও শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা।
১০ই মার্চ	২৫শে ফাল্গুন, সোমবার	পুরী শ্রীশ্রীবালানন্দ তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীপরমগুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব এবং রাত্রে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা।
১১ই মার্চ	২৬শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীপরমগুরু মহারাজজীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে ৪ দিন ব্যাপী শ্রীশ্রী৺বিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞ, বিশেষ পূজা, অভিষেক, অখণ্ড নামসংকীর্তন, ভাণ্ডারা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা।
১৩ই মার্চ	২৮শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার	সায়ংকালে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা, (সন্ধ্যা ঘ: ৫।৩৯।৪৮ থেকে রাত্রি ঘ।৭।১৫।৪৮ সে.) মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতম্।
১৪ই মার্চ	২৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার	শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমা, শ্রীশ্রী ৺বিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। দেবীমন্দিরে পরাৎপর গুরু শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ স্থাপনা তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক।

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজীর শ্রীচরণাশ্রিত শ্রী শঙ্কর ভৌমিক ও শ্রীমতী রুণা ভৌমিকের সৌজন্যে

গুরুর সন্ধানে

মহারাজের ঘরে বসে মহারাজের মুখোমুখি কোন আলোচনায় অংশ নেওয়া; যদিও সেরকম সুযোগ ইদানিং খুব কমই পাওয়া যায়, খুবই ভাগ্যের কথা। তবুও কেন জানিনা তাঁর ঘর খোলা থাকলেই সবাই এসে ভীড় করে। সেদিন হঠাৎ দুজন এসে উপস্থিত হয়ে পড়ায় তাদের দেখে উনি বসতে বললেন। জানা গেল তাঁরা দীক্ষাগ্রহণ করবেন বলে এসেছেন।

দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের কথা আলোচনাকালে এমনই সব কথাবার্তা উঠে এল, যা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সামান্য কথা কিন্তু তার অন্তর্নিহিত ব্যাখা সবার মনেই জ্বল জ্বল করার মত।

মহারাজ শুরু করলেন, আমরা দিনের বেলায় কী চাঁদ বা তারা দেখতে পাই? তার উত্তর সবসময়ই 'না' হবে। আবার পূর্ণিমার রাতে চাঁদের জ্যোৎস্নার আলোর মাঝে যখন আকাশ তারায় তারায় ভরা থাকে তখন কী চাঁদের আলোর মাঝে সূর্যের প্রখর তেজের কথা একবারও মনে আসে। দিনে বা রাত্রে সব সময়েই সূর্য চন্দ্র তারা আকাশময় আছেই। প্রকাশকাল অনুসারে তাদের পরিচয় এবং রূপ পৃথক, তারা চিরকালের চিরদিনের। তাদের আমরা দেখতে পাই আর না-ই পাই।

তেমনি মানুষের মধ্যেই গুরু আছেন। এক এক সময় তাকে দেখা যায় চেনা যায়। আবার এক এক সময় তার পরিচয় গোপন থাকে। লক্ষ্য রাখ, তোমার গুরুকে মানুষের মধ্যেই খুঁজে পাবে।

গোলাপের চারা, রজনীগন্ধার চারা আমরা বসাই। কিন্তু চারা বসাবার সঙ্গেঁ সঙ্গেঁই তো ফুল পাইনা। ফুল ঐ গাছের মধ্যেই বাসা বেঁধেই। অপেক্ষা করতে হয় সেই ফুল ফোটার সময় পর্যন্ত। গুরু হতে পারেন যে কেউ। গুরুরূপে পাবার সময় যিনি গুরু করবেন তার মানসিক প্রস্তুতি তার নিজস্ব দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে। গুরু প্রাপ্তি তৃপ্তি। পূর্ণিমার আলোতে পূর্ণচন্দ্রকে দেখার জন্য দিন গুনি। সূর্যকে দেখতে পাবার জন্য রাত্রির অন্ধকার থেকে ঊষার অরুণ আলোর আশায় প্রতীক্ষা করি। গোলাপফুল পাবার আশায় গোলাপ চারার চারদিকে বেড়া দিই। সার জল দিই তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। ফুল দেখা দিলে কতই না আনন্দ পাই। আমাদের মনের উপরও তেমনি গুরু শিষ্যের সম্পর্ক। সময়, সুযোগ, মানসিক ও চারিত্রিক গঠন অনেকখানি কাজ করে। শিষ্য যেমন গুরু দেখে গুরুভজনায় প্রবৃত্ত হবেন। তেমনি গুরুও শিষ্যকে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তবে শিষ্যত্ব করবেন।

অতএব এখন যেমন দেখা হল, কিছু কথাবার্তা হল, মনে নিশ্চই কিছু দাগ কাটল। সে দাগ মুছে যায় কিনা বা তার স্থায়িত্বই বা কতদিনের হয় এসবের উপরই তো নির্ভর করছে শিষ্যত্ব গ্রহণের কথা।

সংগৃহীত

মায়ার ফাঁদ

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল

"বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ, কেমনে দিই ফাঁকি!
আধেক ধরা দিয়েছিগো আধেক আছে বাকী..."

এই যে আমরা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে সারাক্ষণ হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছি যে বিশ্বসংসারকে ঘিরে, সেটা কী সত্যিই আছে নাকি সবই আমাদের মনের ভ্রম? মনকে যোগে স্থাপন করে করে যদি সমাধিতে পৌঁছানো যায় তখন দেখা যাবে বাইরের জগৎ মনে বাসা বেঁধে আছে, সেখানে আসলে একজনই আছেন 'পুরুষ'— তিনি প্রকৃতির হাত ধরে স্বপ্ন ভ্রমণে বেরিয়েছেন, এখানে 'পুরুষ' অর্থে মানুষকে বোঝানো হচ্ছে না, সেটা হল ইচ্ছাশক্তির আধার।

গুরুদেব যেমন বলেছেন, বাল্মীকি এত পাপ করেছিলেন যে রামমন্ত্রজপ করতে পারছিলেন না, যেই তিনি উল্টোজপ করতে লাগলেন, তখন একই জন্মে তিনি ঋষি হয়ে গেলেন। বল্মীকের স্তূপের ভিতর আত্মভাবে ভাবিত হলেন, অনন্তকাল ধরে নিত্য বিরাজমান রইলেন এবং সেই জন্মেই হয়ে উঠলেন মহামুনি বাল্মীকি। বহুবার সৎসঙ্গে গুরুদেব বলেছেন, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা...", এই অখিল ভূতবর্গ যার দ্বারা বর্ধিত হয়, আবার বিনাশকালে যাঁতে বিলীন হয়, তাঁকে জানতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত। তিনিই ব্রহ্ম। এই জন্য প্রয়োজন জন্মজন্মান্তর ধরে তিল তিল করে তাঁর সাধনা করে পুণ্য সঞ্চয় করা ও পাপকে বর্জন করা। 'গীতা' ব্রহ্ম ঘেঁষা, আর 'চণ্ডী' শক্তি ঘেঁষা অর্থাৎ কিনা কর্ম আর কর্মফল ঘেঁষা। পশুই হোক আর মনুষ্যই হোক সকলেরই বিষয়জ্ঞান আছে। জগৎ মহামায়ার জালে আচ্ছাদিত আর এই মহামায়া হলেন খুবই নিষ্ঠুর।

"তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণা।।" (চণ্ডী, ১।৫৩)

মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহরূপ গর্তে ও মমতারূপ আবর্তে সর্বদাই ঘূর্ণায়মান। আদিগুরু শঙ্করাচার্য্যের মতে শক্তি যদি না হত তাহলে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করতেই পারতেন না। এই জন্য জগতের থেকে জীবের প্রাধান্যই বেশি। জীবজগৎ ঈশ্বরের চৈতন্যে জরে আছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'আমি'র ব্যাখ্যা করছেন 'অহঙ্কার', বলছেন আত্মার পাশে তার অবস্থান। আত্মা দেহ ছেড়ে কোনলোকে যাবে তার অজানা। আবার মৃত্যুর সামনে এসে তার বোধ প্রসারিত হয়। অতএব জন্ম-জীবন-মৃত্যু; এই প্রক্রিয়াটিকে মেনে নেওয়াই ভালো।

তবে সদ্‌গুরু লাভ যাঁদের হয়েছে তাঁদের জন্য পথ অতি সুগম। তাঁরা সৎসঙ্গ পাচ্ছেন, সদ্‌গুরুর নির্দেশিত পথে চলে সৎজীবন অতিবাহিত করতে পারছেন, সৎকর্মের দ্বারা তাঁদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হতে পারছে। তা সত্ত্বেও এমনও ভক্ত আছে যাঁদের বিশেষ কোনও ব্যক্তি বা ভগবানের প্রতি একনিষ্ঠ

ভক্তি অথচ অন্যান্যদের প্রতিও শ্রদ্ধাবান। মহাবীর হনুমান যেমন বলেছিলেন ওনার কাছে প্রাণাধিক প্রিয় রামচন্দ্র ছাড়া আর কেউ নন; যদিও অন্যদের প্রতিও ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একনিষ্ঠ কালীভক্ত হয়েও সব ধর্মমত ও পথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন অবশ্য সেটা ছিল তাঁর অনুসন্ধিৎসা বিচার ও প্রণিপাত পূর্বক পরীক্ষার জন্য। তিনি একটি কথা বলতেন, ভূত কি জানলে ভূতের ভয় থাকে না। আত্মজ্ঞান হলেই শুধুমাত্র হবে না, মায়ার জ্ঞান থাকা চাই যেহেতু ভুবন জোড়া মায়ার ফাঁদ পাতা।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে শ্রীশ্রী বালানন্দ তীর্থাশ্রম, বি-৩/১৭৯, শিবালা, বারানসী, উত্তরপ্রদেশ-২২১০০১-এ ঘর বুকিংয়ের জন্য অগ্রিম অনুদান কোনও ব্যক্তিগত এ্যকাউন্টে জমা দেওয়া হইবে না।

অগ্রিম অনুদান শুধুমাত্র নিম্নলিখিত যে কোনো একটি ব্যাঙ্ক এ্যকাউন্টে জমা দিতে হইবে:

1) Name of the Account : Shree Shree Mohanananda Samaj Seva Samity
Name of the Bank : State Bank of India
Address : Branch-AE Market, Salt Lake, Kolkata 700064

Account No. : 10527195247
IFS Code : SBIN0006794
MICR : 700002110

2) Name of the Account : Shree Shree Mohanananda Samaj Seva Samity
Name of the Bank : ICICI Bank
Address : Branch-BJ Block, Salt Lake, Kolkata 700064

Account No. : 004201032141
IFS Code : ICIC0000042
MICR : 700220004

অনুদান জমা দিবার পূর্বে অবশ্যই কলিকাতা অফিসের সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে-
মোবাইল: 8017227099

'মা যে আজি এলেন দ্বারে...'

শ্রীশ্রীদুর্গাপুজোর আগমনী চিন্তা করলেই মনের মাঝারে যে চিত্রটি ভেসে আসে তাহল বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালীর' অপু ও দুর্গা চরিত্রদুটি— ছুটছে রেল, দুলছে হাওয়ায় কাশফুল আর দিদি তাকিয়ে দেখে ভাইয়ের কাছে রেলগাড়ি চড়ানোর আব্দার জানাচ্ছে। বর্তমান যুগ যতই আধুনিকতার উচ্চশিখরে উঠুক না কেন, তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেন বাংলার ঘরে ঘরে সাময়িক সাবেকীয়ানা বিরাজ করে। কৈলাস থেকে উমার বাপের বাড়ি মা মেনকার কাছে এসে চারদিন থাকা, উমার পতিবিরহ গিরিরাজের সকল উদ্বেগের অবসান ইত্যাদি কত বিচিত্র ভাবরসের পৌরাণিক কাহিনী, আগমনী এসব কিছুকে আশ্রয় করেইতো বাঙালী মনের বিশাল উৎসাহ। এই মাধুর্য গ্রামবাংলার এক মহামূল্য সম্পদ।

রাবনকে বধ করে সীতা উদ্ধারের প্রয়োজনেই হোক অথবা দেবলোকে মহিষাসুরকে বধ করে স্বর্গরাজ্যে শান্তি অনয়নের জন্যই হোক না কেন—শরৎকালে পূজিতা হন বলেই এই পূজাকে শারদীয়া পূজাও আখ্যা দেওয়া হয়। শারদীয়া পূজাতো শুধু দেবী দুর্গার পূজা নয়,— সবস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা এই তিন রূপের মিলিত মাতৃপূজা। তিনিই মহামায়া তাঁর নিত্যলীলায় জীবকে বদ্ধ করেন, কখনও মুমুক্ষু করেন আবার কখনও বা সদ্‌গুরু-প্রকাশের মাধ্যমে ত্রাণ করেন।

আমরা আমাদের গুরুদেবের মধ্যে মাতৃকন্যাময়ী রূপটিকেই চিরকাল প্রত্যক্ষ করেছি পূজার্চনায়। আমাদের অন্তর জুড়ে গুরুমহারাজই আছেন। আসুন আমরা ভক্তি অর্ঘ্য গঙ্গাজলে মাতৃস্বরূপা শ্রীগুরুর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই, আমাদের ভক্তিবিনম্র প্রণামটি তাঁরই শ্রীচরণকমলে নিবেদন করি।

জয়গুরুদেব, জয় জগন্মাতা।

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকার পাঠক-পাঠিকা,
লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, গ্রাহকবৃন্দ ও
দেশ-বিদেশের সমগ্র ভক্ত-শিষ্যমণ্ডলীর উপর শুভ
শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীগুরু
মহারাজজীর শুভাশীর্বাদ বর্ষিত হোক।।